আবদুস শহীদ নাসিম

মুসলিম সমাজে প্রচলিত

১০১ ভুল

মুসলিম সমাজে প্রচলিত
১০১ ভুল

আবদুস শহীদ নাসিম

বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা সোসাইটি

এই বইটি কেন? কাদের জন্যে?

এ বইটি মুমিনদের জন্যে। যারা এক লা-শারিক আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান রাখেন তাদের জন্যে। যারা আখিরাতের জীবনের প্রতি ঈমান রাখেন, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.- কে সর্বশেষ নবী মানেন এবং আল কুরআনকে আল্লাহ্‌র কিতাব হিসেবে জানেন এবং অবশ্য পালনীয় মনে করেন- এ বই তাদের জন্যে। যারা মুসলিম হিসেবে জীবন যাপন করতে চান এ বই তাদের জন্যে।

কারণ, তারা হবে ইসলামের নিখাদ অনুগামী। তারা হবে নির্ভেজাল তাওহীদে বিশ্বাসী, পদে পদে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্‌র পদাংক অনুসারী আর কুরআন সুন্নাহ্‌র অনাবিল জ্ঞানের অধিকারী।

কারণ, মুসলিম সমাজে বিরাজ করছে দীন-ধর্ম, ইবাদত বন্দেগি, সওয়াব নেকী, ফায়দা ফযিলত, মুক্তি মাগফেরাত, উসিলা নাজাত ইত্যাদির নামে শিরক বিদআত, কুফরি জাহেলিয়াত, অজ্ঞতা অন্ধতা আর পরানুগামী প্রথা পার্বন, রসম-রেওয়াজ।

এসবই যেনো দুধে চনা, ভাতে কণা। শীষে চিটা, নৌকায় ছিদ্র। শ'তে বিশ, ঘৃতে গরল।

মুমিনদের চলার পথ অনাবিল ইসলাম। আর আবিলতা মুক্ত হবার জন্যে চাই সচেতনতা। সেই অদম্য আকাংখার ফসলই এ বই।

প্রতি মাসের তৃতীয় শুক্রবার সকালে আমরা ইস্কাটনস্থ বিয়াম অডিটরিয়ামে কুরআন সুন্নাহ্‌র আলোকে বিষয় ভিত্তিক যে আলোচনা পেশ করি, এ বই মূলত তারই ৩৬ এবং ৩৭তম আলোচনা।

বইয়ের শিরনামে '১০১ ভুল' কথাটি রয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, গুণে গুণে ১০১টি ভুল এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। বরং বাংলা বাকরীতি ও বাক্‌ধারা অনুযায়ী ১০১ মানে- অনেক। 'অনেক অর্থেই' এখানে ১০১ সংখ্যাটি ব্যবহার করা হয়েছে।

সমাজে যতো ভুল বিরাজ করছে তার সবই এ বইতে উল্লেখ হয়নি। সম্মানিত পাঠকগণ আরো যেসব ভুল এই বইতে উল্লেখ হয়নি মনে করবেন, লিখিত জানালে আমরা পরবর্তী মুদ্রণে সেগুলো সংযোজন করবো ইনশাল্লাহ।

এ বইতে যেসব ভুল আলোচিত হয়েছে, কেউ যদি তার কোনোটিকে ভুল নয় মনে করেন, তবে কুরআন এবং সহীহ হাদিসের ভিত্তিতে খন্ডণ করে জানালে আমরা তা সংশোধন করে নেবো ইনশাল্লাহ।

বইটি আমাদের সমাজকে কিছুটাও যদি সচেতন করে, তবেই সার্থক হবে লেখকের প্রচেষ্টা।

আবদুস শহীদ নাসিম
জুন ২০১০ ঈসায়ী

সূচিপত্র

৪০৫

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

মুসলিম সমাজে প্রচলিত ১০১ ভুল

ভুলের প্রবেশ দ্বার, ভুলের লালন ও ইসলাম

১. মুসলিম সমাজে ইসলাম ও জাহিলিয়াতের অবস্থান

দক্ষিণ এশিয়ার মুসলিমদের মধ্যে সরাসরি কুরআন সুন্নাহ অনুসরণের চাইতে পীর বুযুর্গ, অলি, দরবেশ এবং মযহাবি আলেম উলামাগণকে অনুসরণের প্রবণতা বেশি। এ প্রবণতা এ অঞ্চলে ইসলামের আগমণের সময় থেকেই লক্ষ্য করা যায়।

এর অনেকগুলো কারণ রয়েছে। কয়েকটি বড় বড় কারণ হলো:

১. এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারিত হয় ব্যবসায়ী, মুজাহিদ এবং ব্যক্তিগত দা'য়ীদের মাধ্যমে। তাঁরাই ছিলেন এদেশের লোকদের কাছে ইসলামের মডেল এবং ইসলামি জ্ঞানের সোর্স। ফলে কুরআন সুন্নাহর প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভাবে সর্বক্ষেত্রে লোকদের পক্ষে ইসলামের যথার্থ ও পূর্ণাঙ্গ (perfect) জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয়নি।

২. এসব প্রচারক ব্যক্তিগণ যিনি যে এলাকায় সেটেল হয়েছিলেন, সে এলাকায় তিনি ইসলামের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁর মাধ্যমে মূর্তি ও ব্যক্তি পূজারি ব্যক্তিগণ ইসলামে দীক্ষিত হবার কারণে তাঁর মৃত্যুর পর নব দীক্ষিত স্বল্প জ্ঞানী মুসলমানরা তাঁকে মহামানব ভাবতে থাকে এবং তাঁকে পূজনীয় ভাবতে থাকে।

৩. ইসলামের প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে এসব মনীষীদের কবরকে কেন্দ্র করে একদল স্বার্থান্বেষী লোকের আবির্ভাব ঘটে। তারা তাঁদের কবরের খাদেম বনে যায়, কবরকে মাযার বানিয়ে নেয়, কবর সাজ সজ্জা করতে থাকে এবং নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্যে কবরের দিকে মানুষকে আকৃষ্ট ও আহবান করতে থাকে।

-এভাবেই চালু হয় কবর কেন্দ্রিক শিরক ও বিদ'আতের সিলসিলা।

৪. কুরআন এবং সুন্নাহ হিদায়াতের মূল উৎস হিসেবে চালু না হওয়ায় বিকল্প হিসেবে যত্রতত্র, পাত্র অপাত্র নির্বিশেষে পীর মুরিদীর সিলসিলা চালু হয়। প্রথম প্রথম অনেক ক্ষেত্রেই এই সিলসিলা নেক নিয়্যতে চালু হয়। কিন্তু পরবর্তীতে

এই সিলসিলার মধ্যেও ব্যবসায়িক মনোভাব এবং স্বার্থ জড়িয়ে পড়ে। এর ফলে এখানে ঢুকে পড়ে-

ক. গদ্দীনশীন হবার সিলসিলা,

খ. খেলাফত আদান প্রদানের সিলসিলা,

গ. কবর কেন্দ্রিক মাযার প্রতিষ্ঠার সিলসিলা,

ঘ. পীরের পুত্রগণের সাহেবজাদা হবার বিশেষ মর্যাদা,

ঙ. উরস আয়োজনের ব্যবস্থা,

চ. মুরিদ ভাগাভাগির ব্যবস্থা,

ছ. ব্যক্তি পূজার সিলসিলা।

৫. এ অঞ্চলে ইসলামের আগমণের পর নব দীক্ষিত মুসলমানগণকে কুরআন পাঠ, নামায রোযা শিক্ষা দান এবং মস্‌লা মাসায়েল অবহিত করার জন্যে প্রথমে মকতব এবং পরে মাদরাসা প্রতিষ্ঠার কাজ চালু হয়।

প্রায় সকল মকতব মাদরাসাই মাযহাবি মকতব মাদরাসা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

এসব মকতব মাদারাসা থেকে ছাত্ররা-

ক. কুরআন পাঠ, নামায পড়া এবং মসলা মাসায়েল শিখেন।

খ. মাদরাসাগুলোর উপরের ক্লাসের দিকে হানাফি মযহাবের ফিকাহ্ পড়ানোকে প্রাধান্য দেয়া হয়।

গ. বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্ব পর্যন্ত মাদরাসা গুলোতে মাতৃভাষার পরিবর্তে শিক্ষা দানের মাধ্যম ছিলো ফারসি এবং উর্দু। এখনো কওমি মাদারাসাগুলোতে উর্দু মাধ্যমেই শিক্ষা দেয়া হয়।

ফলে, মাদরাসাগুলো ইসলামের আলো জ্বালিয়ে রাখলেও শিরক, বিদ'আত এবং জমাট বাঁধা অজ্ঞতা, অন্ধতা ও জাহিলিয়াত দূর করার ক্ষেত্রে কাংখিত মানের সাফল্য অর্জন করতে পারেনি এবং পারছেনা।

৬. এ দেশে ইসলামের প্রসার ঘটে প্রধাণত মুসলিম শাসক, সেনাপতি ও দ্বিগ্বিজয়ীগণের মাধ্যমে। পূর্ববর্তী শাসকদের অত্যাচার নিপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে এদেশের মানুষ মুসলিম শাসক ও সেনাপতিগণকে স্বাগত জানায় এবং দলে দলে সপরিবারে মুসলমান হয়ে যেতে থাকে।

এই লোকদের মধ্যে খুব কম লোকেরই ইসলামের যথার্থ শিক্ষা লাভ করার সুযোগ হয়। ফলে-

ক. এদের বিপুল সংখ্যার মধ্যে ইসলামের তেমন কোনো জ্ঞানই ছিলোনা।

খ. জ্ঞানের অভাবে এ ধরণের লোকেরা ইসলামের কিছু আনুষ্ঠানিক বিধি বিধান পালন করলেও ইসলামের সামগ্রিক বিধান সঠিকভাবে পালন করা তাদের পক্ষে সম্ভব হতোনা। এ ধারা প্রজন্মের পর প্রজন্ম চলে আসছে।

গ. এ অঞ্চলের লোকেরা ব্যাপকভাবে ইসলাম গ্রহণ করলেও তাদের পূর্ব পুরুষদের প্রথা, রসম রেওয়াজ এবং পূজা পার্বনের ধ্যান ধারণা তাদের মাথা থেকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে ফেলা সম্ভব হয়নি। এরও মূল কারণ ইসলামের যথার্থ জ্ঞানের স্বল্পতা।

ঘ. এ ধরণের অজ্ঞ লোকেরা মুসলমানিত্বের কাজ হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যক্তি ও মাযার কেন্দ্রিক কার্যক্রমের সাথে জড়িয়ে পড়ে এবং বিপুল সংখ্যক লোক নামায রোযা না করেও নিজেদেরকে মুসলমান বলেই ভাবেত থাকেন। এ ধারাও অব্যাবহত আছে।

উপরোক্ত কারণসমূহের প্রেক্ষিতে এবং বিশেষত সরাসরি কুরআন হাদিস অধ্যয়ন ও অনুসরণ না করার প্রেক্ষিতে এ দেশের মুসলিম সমাজে ঈমান আকিদা, ধ্যান ধারণা, বিশ্বাস দৃষ্টিভংগি, ইবাদত বন্দেগি এবং আচার অনুষ্ঠান ও রসম রেওয়াজের মধ্য দিয়ে ঢুকে পড়েছে শত রকম জাহিলিয়্যাত।

ফলে-

- মুসলমানদের মধ্যে প্রবেশ করেছে শিরক, বিদআত।
- অনেক ক্ষেত্রে বিলুপ্ত হয়ে পড়েছে হালাল হারামের তারতম্য।
- উপেক্ষিত হচ্ছে ফরয নফলের পার্থক্য।
- ফরযের চাইতে প্রধান্য পাচ্ছে নফল।
- হালালের চাইতে প্রাধান্য পাচ্ছে হারাম।
- সুন্নতের চাইতে প্রাধান্য পাচ্ছে বিদ'আত।
- তাওহীদের চাইতে প্রাধান্য পাচ্ছে শিরক।
- সত্য ন্যায় ও আদর্শের চাইতে প্রাধান্য পাচ্ছে ব্যক্তি।
- সত্য সন্ধানের চাইতে প্রধান্য পাচ্ছে পূজনীয় ব্যক্তি ও অন্ধ অনুকরণ।
- কুরআন হাদিস জানা বুঝার চাইতে প্রাধান্য পাচ্ছে সহজে সওয়াব হাসিলের মানসিকতা। প্রাধান্য পাচ্ছে জ্ঞানের চাইতে অজ্ঞতা, আলোর চাইতে অন্ধতা।

২. ইসলামের পথ আলাদা জাহিলিয়াতের পথ আলাদা

কিন্তু, একথা পরিষ্কার, ইসলাম এবং জাহিলিয়াতের পথ সম্পূর্ণ আলাদা। ইসলামের বাহক বা জাহিলিয়াতের বাহক যার মধ্যেই উভয়টি একত্রিত হবে, তার জীবন থেকে একটিকে আরেকটি গ্রাস করে নেবে। তার বিশ্বাস ও চরিত্রে যেটির ভিত্তি দুর্বল সেটিকে গ্রাস করে নেবে যেটির ভিত্তি শক্তিশালী, সেটি।

৩. ইসলামের ভিত্তি, বিধান ও মডেল

ইসলামি জ্ঞান, হিদায়াত ও জীবন পদ্ধতির মূল ভিত্তি হলো:

১. আল্লাহর কালাম আল কুরআন,

২. আখেরি নবী মুহাম্মদ রসূলুল্লাহর সুন্নাহ বা হাদিস।

কুরআন সুন্নাহ প্রদত্ত ইসলামের করণীয় ও পালনীয় বিধানের স্তর সমূহ হলো:

১. ফরয। ২. ওয়াজিব। ৩. নফল। ৪. মুবাহ।

এগুলো প্রথম থেকে ক্রমানুসারে গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ অবশ্য করণীয়, করণীয়, উত্তম, ঐচ্ছিক।

ইসলামের ভিত্তি ও বিধান সমূহের মডেল হলেন:

১. মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সা. এবং
২. সাহাবায়ে কিরামের জামাত বা সমষ্টি।

৪. ইসলামের দৃষ্টিতে জাহিলিয়াত ও জাহিলিয়াতের বৈশিষ্ট্য

ইসলামের দৃষ্টিতে জাহিলিয়াত হলো:

১. আল্লাহর সম্পর্কে অজ্ঞতা,
২. শিরক,
৩. কুফর এবং মনগড়া (মানব রচিত) মতবাদে বিশ্বাস,
৪. ফিসক, যুলুম,
৫. বিদ'আত।

জাহেলিয়াতের ভিত্তি হলো:

১. অজ্ঞতা,
২. অন্ধ অনুসরণ,
৩. আত্মার দাসত্ব,
৪. স্বার্থপূজা,
৫. ভ্রান্ত রসম রেওয়াজ।

ইসলামের দৃষ্টিতে জাহিলিয়াতের বিধানসমূহ হলো:

১. হারাম (অকাট্য নিষিদ্ধ), অথবা
২. মাকরূহ তাহরিমি (নিষিদ্ধের কাছাকাছি মন্দ), অথবা
৩. মাকরূহ তানযিহি (মন্দ, তবে নিষিদ্ধ নয়)।

৫. ইসলামের পথ জাহিলিয়াতের পথ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত পবিত্র

জাহিলিয়াতের কোনো প্রকার মিশ্রণ ইসলাম বরদাশত করেনা। ইসলামের করণীয় বর্জনীয় বর্ণনা করার পর আল্লাহ্ তায়ালা বলেন:

وَأَنَّ هَـٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

অর্থ: আর আমার এই (ইসলামের) পথ সরল সঠিক সুদৃঢ় পথ। তোমরা এরি অনুসরণ করো, ভিন্ন পথসমূহের অনুসরণ করোনা; করলে তোমাদেরকে তাঁর (আল্লাহর) পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। এ হলো তোমাদের জন্যে আল্লাহর নির্দেশ, যাতে করে তোমরা সতর্ক হও। (সূরা ৬ আনআম: আয়াত ১৫৩)

আল্লাহর পথ ইসলামের অনুসরণের জন্যে তিনি কুরআনকে অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন:

وَهَـٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

অর্থ: আর এ কিতাব আমি নাযিল করেছি মহা কল্যাণময়। সুতরাং তোমরা এর অনুসরণ করো এবং সাবধান হও। আশা করা যায় তোমাদের প্রতি রহম করা হবে। (সূরা ৬ আনআম : আয়াত ১১৫)

মহান আল্লাহ আরো বলেন:

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

অর্থ: তারা কি জাহিলিয়াতের বিধি বিধান, নিয়ম কানুন মেনে চলতে চায়? অথচ বিশ্বাসীদের জন্যে বিধান প্রদানে আল্লাহর চাইতে শ্রেষ্ঠ কে? (সূরা ৫ মায়িদা : ৫০)

জাহিলিয়াত পরিত্যাগ করে আল্লাহর পথে চলার জন্যে আল্লাহর রসূলের অনুসরণ অপরিহার্য:

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

অর্থ: হে নবী! তাদের বলে দাও: তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ করো, তবেই আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ মাফ করবেন। (সূরা ৩ আলে ইমরান : আয়াত ৩১)

রসূলুল্লাহ সা. পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন:

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ ، تَمَسَّكُوْبِهَا وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بَالنَّوَاجِذِ •

অর্থ: তোমাদেরকে অবশ্যি আমার সুন্নত এবং হিদায়াত প্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত অনুসরণ করে চলতে হবে। তোমরা তা শক্ত করে আঁকড়ে

ধরবে এবং দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে অটল হয়ে থাকবে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল : বর্ণনা-ইরবাজ ইবনে সারিয়া রা.)

৬. হালাল এবং হারাম সুস্পষ্ট, মাঝখানে সন্দেহজনক বিষয় সমূহ

কুরআন এবং হাদিসে হারাম ও নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। রসূলুল্লাহ সা. বলেন:

اَلْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَ ذَالِكَ اُمُوْرٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَدْرِىْ كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ اَمِنَ الْحَلَالِ هِىَ اَمِ الْحَرَامِ؟ فَمَنْ تَرَكَهَا اِسْتَبْرَاءً لِدِيْنِه وَعِرْضِه فَقَدْ سَلِمَ وَمَنْ وَاقَعَ شَيْئًا مِنْهَا يُوْشِكُ اَنْ يُوَاقِعَ الْحَرَامَ كَمَا اَنَّ مَنْ يَّرْعٰى حَوْلَ الْحِمٰى اَوْشَكُ اَنْ يُوَاقِعَه اَلَا وَاِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى اَلَا وَاِنْ حِمَى اللهِ مَحَارِمُه-

অর্থ: হালাল সুস্পষ্ট, হারামও সুস্পষ্ট। এ দুটির মাঝখানে কতিপয় জিনিস সন্দেহপূর্ণ। সেগুলো সম্পর্কে অনেক লোকেরই জানা নেই যে, আসলে তা হালাল না হারাম। এরূপ অবস্থায় যে ব্যক্তি স্বীয় দীন ও স্বীয় মান মর্যাদা রক্ষার জন্যে সেসব থেকে দূরে থাকে, সে নিশ্চয়ই নিরাপদ থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি তন্মধ্য থেকে কোনো কিছুর সাথে জড়িয়ে পড়বে, তার পক্ষে হারামের মধ্যে পড়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। যে ব্যক্তি নিজের জন্তুগুলোকে নিষিদ্ধ চারণভূমির আশে-পাশে চরায়, তার পক্ষে সে নিষিদ্ধ অঞ্চলের ঢুকে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। তোমরা শোনো, প্রত্যেক রাজা-বাদশাহরই একটি 'সুরক্ষিত চারণভূমি' থাকে। আরও শোনো, আল্লাহর হারাম করা জিনিসগুলোই তাঁর সংরক্ষিত চারণভূমি। (বুখারি, মুসলিম, তিরমিযি)

৭. শিরক এবং বিদ'আত

শিরক এবং বিদআত ধর্মের তথা ইসলামের ছদ্মবেশেই ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করে। শিরকের মধ্যে আল্লাহকে অবশ্যি রাখা হয়। তবে,

১. আল্লাহ ও বান্দার মাঝখানে অন্যদেরকে মাধ্যম বানিয়ে নেয়া হয়, কিংবা
২. আল্লাহর সাথে কারো আত্মীয়তার সম্পর্ক সৃষ্টি করা হয়, অথবা
৩. কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ বানানো হয়, বা
৪. কাউকে আল্লাহর প্রাপ্য অধিকারে শরিক করা হয়, নতুবা
৫. কারো প্রতি আল্লাহর ক্ষমতা আরোপ করা হয়।

বিদ'আতও ধর্মের রূপ ধারণ করেই ইসলামে প্রবেশ করে এবং একাকার হয়ে থাকে। বিদআত হলো সেইসব নিয়ম কানুন, রসম রেওয়াজ, বা অনুষ্ঠান, বা

কার্যক্রম, যা ধর্মের নামে চালু করা হয় এবং ধর্মীয় কাজ হিসেবে পালন করা হয়ে থাকে। অথচ আল্লাহর রসূল সা. নিজের কথা, কাজ বা অনুমোদন দ্বারা তা চালু করেননি। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন:

فَانَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرُ الْهَدْىِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

অর্থ: জেনে রাখো, সর্বোত্তম বাণী আল্লাহর কিতাব। আর সর্বোত্তম পথ ও পন্থা হলো মুহাম্মদের প্রদর্শিত পথ ও পন্থা। পক্ষান্তরে সর্ব নিকৃষ্ট কার্যক্রম হচ্ছে (দীনের মধ্যে) নবোদ্ভাবিত কার্যক্রম (বিদআত)। আর প্রতিটি বিদআতই (নবোদ্ভাবিত কর্মই) সুস্পষ্ট গোমরাহী। (সহীহ মুসলিম)

অপর বর্ণনায় রয়েছে, তিনি একথার পরে বলেছেন: 'আর প্রতিটি গোমরাহীই জাহান্নামে।'

আমাদের দেশে দীন ও শরিয়তের মধ্যে যেসব শিরক, বিদআত, কুফর, হারাম, মাকরূহ, যুলুম বিভিন্নভাবে প্রবেশ করেছে এবং একাকার হয়ে আছে, সে সম্পর্কে মুসলিম সমাজে সচেতনতা সৃষ্টি অতীব জরুরি।

সে উদ্দেশ্যেই এ আলোচনা। এ আলোচনায় আমরা কতিপয় উল্লেখযোগ্য ভুল তুলে ধরবো।

বইয়ের পরিসর সংক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে বক্তব্য সংক্ষেপ করা হয়েছে।

প্রচলিত ১০১ ভুল

ঈমান-আকিদাগত ভ্রান্তি সমূহ

১. আমার দাদা একজন বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ইন্তেকাল করেছেন। আমরা তাঁর কবর কেন্দ্রিক একটি মসজিদ তৈরি করতে চাই। এটা জায়েয হবে কি? উল্লেখ্য, আমাদের দেশে এরকম অসংখ্য মসজিদ তৈরি হয়েছে।

কবরে বা কবর কেন্দ্রিক মসজিদ তৈরি করা ইসলামে সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ।

যেবার অসুস্থ হয়ে রসূলুল্লাহ সা. ইন্তেকাল করেন, সেই অসুস্থতার সময় মৃত্যুর পাঁচদিন পূর্বে তিনি সাহাবীগণকে বলেন:

اَلاَ وَاَنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدًا ، اَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدًا اِنِّىْ اَنْهَاكُمْ عَنْ ذَالِكَ •

অর্থ: সাবধান! তোমাদের পূর্বের লোকেরা তাদের নবী এবং নেক লোকদের কবরকে মসজিদ বানিয়ে নিতো। সাবধান! তোমরা কবরকে মসজিদ বানিয়োনা, আমি তোমাদের নিষেধ করছি এই কাজ। (সহীহ মুসলিম, হাদিস নম্বর ৫৩২)

আল্লাহর রসূলের এই হাদিস বহু সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। বুখারি, মুসলিমসহ হাদিস গ্রন্থাবলীতে তাঁর মৃত্যুর পূর্বেকার এই বক্তব্য সংক্ষিপ্ত এবং বিস্তারিত আকারে বর্ণিত হয়েছে।

এ হাদিসগুলোতে একথাও রয়েছে, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: "তোমরা আমার কবরকে মসজিদ বানিয়োনা।"

সুতরাং যারা অলি বুযুর্গ ও নেক লোকদের কবরে বা কবর কেন্দ্রিক মসজিদ বানায়, তারা ঐ অলি, বুযুর্গ ও নেক লোকদেরকে ভালো মানুষ বলে স্বীকার করেনা। কারণ, তারা উনাদের আদর্শের খেলাফ কাজ করে। উনারা আল্লাহর রসূলের সুন্নত মতো চলতেন, এরা চলেনা।

২. আমাদের দেশে অনেক জায়গায় কবর পাকা করা হয়, কবরে গম্বুজ বানানো হয়, কবর কেন্দ্রিক উরস, ওয়াজ মাহফিল, ইসালে সওয়াবের অনুষ্ঠান, এমনকি উৎসব ও মেলা করা হয়, এগুলো কি সুন্নত সম্মত?

এগুলোর কোনোটিই রসূলুল্লাহ সা. করেন নাই, করতে বলেন নাই এবং সাহাবীগণও করেন নাই।

রসূলুল্লাহ্ সা. কবরকে ইবাদতের স্থান বানাতে নিষেধ করেছেন এবং উঁচু কবর ভেঙ্গে সমান করে দিতে নির্দেশ দিয়েছেন।

সুতরাং এগুলো সবই সুন্নতের খেলাফ। এগুলোর ভেতরে রয়েছে শিরক, বিদআত এবং নিষিদ্ধ কার্যক্রম।

৩. আমাদের দেশে দেখা যায়, অনেকেই বিপদ দূর হওয়ার জন্যে এবং উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে মাযারের নামে মান্নত করে, ঐ কবরে দাফন করা মৃত বুযুর্গ ব্যক্তির আশির্বাদ লাভের জন্যে তার মাযারে গিয়ে দোয়া প্রার্থনা করে, ফরিয়াদ করে। -এগুলো কি জায়েয?

এগুলো শুধু নাজায়েযই নয়, এগুলো সুস্পষ্ট শিরক। ইসলামের সুস্পষ্ট ঈমান আকিদা হলো:

- মৃত ব্যক্তি যিনিই হোন না কেন, তিনি মৃতই। তার পক্ষে কারো লাভ বা ক্ষতি করা সম্ভব নয়।
- তিনি নিজে জান্নাতে যাবেন কিনা তাও তিনি জানেন না।
- তার কবর আযাব হচ্ছে কিনা- তাও কেউ জানেনা।
- তার কবর আযাব হলে তা থেকে নিজেকে রক্ষা করার ক্ষমতাও তার নেই।
- সুতরাং তার পক্ষে অন্য কাউকে কোনো প্রকার সাহায্য করার প্রশ্নই আসেনা।

এ প্রসঙ্গে আল কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত সমূহ দেখুন:

সূরা ০৬ আল আন'আম : আয়াত ৪০-৪১ ও ৫৬। সূরা ০৭ আল আ'রাফ : আয়াত ১৯৪,১৯৭। সূরা ১৭ ইসরা : আয়াত ৬৭। সূরা ১৯ মরিয়ম : আয়াত ৪৮। সূরা ২২ হজ্জ : আয়াত ৭৩। সূরা ২৬ শোয়ারা : আয়াত ৮২। সূরা ৩৫ ফাতির : আয়াত ১৩, ৪০। সূরা ৩৯ যুমার : আয়াত ৩৮। সূরা ৪০ গাফির : আয়াত ৬৬। সূরা ৭২ জিন : আয়াত ১৮।

৪. কবরকে মাযার বলা বৈধ কি? আমাদের দেশে অনেক বুযুর্গ ও নেতার কবরকে মাযার বলা হয়।

মাযার মানে- দর্শনীয় স্থান, যেখানে পর্যটকরা দেখতে যায়।

কবরকে মাযার বলা যায়না। রসূলুল্লাহ সা. কবরকে মাযার বলেন নাই, সাহাবীগণও বলেন নাই। আল্লাহর রসূলের কবরকে মাযার বলা হয়না, কোনো সাহাবীর কবরকেও মাযার বলা হয়না।

কবরকে মাযার বলা ইসলামের নীতি ও আদর্শের খেলাফ। কবরকে মাযার বলার উদ্দেশ্য তিনটি:

১. ঐ কবর পূজা করার জন্যে মানুষকে আহবান জানানো, অথবা

২. ঐ কবরে যাকে দাফন করা হয়েছে তার অনুসারী হওয়া, কিংবা
৩. যারা কবরকে ব্যবসা কেন্দ্র বানিয়েছে, তাদেরকে পয়সা দেয়া।

-এর কোনোটিই ইসলামে বৈধ নয়।

-তবে নিজের মৃত্যুর কথা স্মরণ করার জন্যে রসূলুল্লাহ সা. কবর যিয়ারত করাকে বৈধ করেছেন।

৫. আমাদের দেশে বিশেষ বিশেষ পীর, বুযুর্গ, দরবেশ ও মৃত ব্যক্তিদের 'অলি' 'অলি আল্লাহ' বলা হয়। আসলে অলি আল্লাহর সঠিক পরিচয় কী?

'অলি' বা 'অলি আল্লাহ' সম্পর্কে আমাদের সমাজে অনেক ভুল ধারণা রয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে বিশেষ বেশভূষা এবং ধরণ ধারণের ব্যক্তিদেরকে লোকেরা 'আল্লাহর অলি' বা 'অলি আল্লাহ' মনে করে। কিন্তু আসল ব্যাপর তা নয়।

অলি শব্দের অর্থ- বন্ধু, অভিভাবক, পৃষ্ঠপোষক। অলির বহু বচন আওলিয়া।

'অলি আল্লাহ' মানে- আল্লাহর বন্ধু বা আল্লাহর প্রিয়জন। আল্লাহর বন্ধু বা প্রিয়জন কে, তা কারো দাবি বা ডাকা দ্বারা নির্ধারিত হয়না। তা নির্ধারণ করার দায়িত্ব আল্লাহর।

আল্লাহ নিজেই কুরআন মজিদে 'অলি আল্লাহর' পরিচয় দিয়েছেন এভাবে :

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ • الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ •

অর্থঃ জেনে রাখো! আল্লাহর অলিদের ভয়ও নেই, দুশ্চিন্তাও নেই- যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে। (সূরা ১০ ইউনুস : ৬২-৬৩)

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ • وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ •

অর্থঃ নিশ্চয়ই তোমাদের অলি হলেন আল্লাহ এবং তাঁর রসূল আর ঈমানদার লোকেরা- যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত দিয়ে দেয় এবং আল্লাহর প্রতি অনুগত বাধ্যগত থাকে। যারা অলি মানে আল্লাহকে এবং আল্লাহর রসূলকে আর ঈমানদার লোকদেরকে, তারাই আল্লাহর দল এবং আল্লাহর দলই থাকবে বিজয়ী। (সূরা আল মায়িদা : আয়াত ৫৫-৫৬)

এ দুটি আয়াত থেকে জানা গেলো, সকল মুমিনই আল্লাহর অলি, যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং আল্লাহর অনুগত বাধ্যগত থাকে।

ইমাম তাহাবী তাঁর 'আল আকীদা' গ্রন্থে আহলুস সুন্নত ওয়াল জামা'ত ‍এর 'অলি আল্লাহ' সংক্রান্ত আকীদা পেশ করেছেন এভাবেঃ

اَلْمُؤْمِنُ هُمْ اَوْلِيَاءُ الرَّحْمَانُ وَاَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللهِ اَطْوَعَهُمْ وَاَتْبَعَهُمْ لِلْقُرْاٰن

অর্থঃ সকল মুমিনই আল্লাহ রহমানের অলি। তাদের মধ্যে ত .হর কাছে অধিক সম্মানিত তারা, যারা আল্লাহর অধিকতর অনুগত এ কুরআনের অধিকতর অনুসারী।"

৬. কাশফ এবং ইলহামের মাধ্যমে পাওয়া নির্দেশ সম্পর্কে য়তের বিধান কি? অলিগণ নাকি এভাবে নির্দেশ পেয়ে থাকেন?

অনেক সময় বিভিন্ন পীর বুযুর্গ সম্পর্কে বলা হয়ঃ অমু কাশফ হয়েছে, অমুকের কাছে ইলহাম হয়েছে। কাশ্‌ফ ও ইলহাম দীনি জ র ভিত্তি নয়।

এ ধরণের কথাবার্তা সবই দীনের মধ্যে বিভ্রান্তি কারী। এ ব্যাপারে ইসলামের সুস্পষ্ট নীতিমালা হলোঃ

১. দীনি জ্ঞানের উৎস হলো আল কুরআন এবং সুন্না পীর বুযুর্গের কাশফ ও ইলহাম দীনি জ্ঞানের উৎস নয়।

২. দীনের ইলম, হুকুম আহকাম, বিধি বিধান, ল হারাম, সওয়াব গুনাহ ইত্যাদির ভিত্তি হলো আল কুরআন এবং সুন্না পীর বুযুর্গের কাশফ এবং ইলহাম নয়।

৩. ইসলামি বিশেষজ্ঞগণের ইজতিহাদ, কি ও মতামত কুরআন-সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক হলে পরিত্যাজ্য। কুরআ ন্নাহ কর্তৃক অনুমোদিত হলে গ্রহণযোগ্য।

৪. কুরআন সুন্নাহই ইসলাম এবং ইসল শরিয়তের উৎস ও মানদন্ড, অন্য কিছু নয়।

৭. অনেকে বলেন, স্বপ্নে নির্দেশপ্রাপ্ত . বলছি/করেছি

এমাত্র নবীগণের স্বপ্ন ছাড়া আর কা স্বপ্নই হিদায়াত লাভের মাধ্যম নয়। শুধু নবীগণই স্বপ্নে অহি লাভ করতেন।

ইসলামের অকাট্য মূলনীতি হলো

১. একমাত্র কুরআন সুন্নাহই 'আদদীনুল ইসলাম' বা ইসলামি জীবন ব্যবস্থার উৎস এবং মূলসূত্র। অন্য সকলের কথা ও কাজ কুরআন সুন্নাহ সমর্থিত হলেই কেবল গ্রহণযোগ্য নতুবা পরিত্যাজ্য।

২. স্বপ্ন দ্বারা অদৃশ্য জ্ঞান অর্জন হয়না এবং শরিয়তের বিধান নির্ণয় হয়না।

৩. স্বপ্নের চাইতে জাগ্রত অবস্থার চিন্তা গবেষণা বা ইজতিহাদের মূল্য অনেক বেশি- যদি তা কুরআন সুন্নাহর মূলনীতি দ্বারা সমর্থিত হয়।

৪. কোনো সমস্যার সমাধান এবং সংঘটিতব্য বিষয়ে কোনো কোনো স্বপ্নে ইংগিত পাওয়া যেতে পারে। তবে সে সম্পর্কে কুরআন সুন্নায় অভিজ্ঞ ব্যক্তির ব্যাখ্যা আবশ্যক।

৫. কোনো স্বপ্ন বা স্বপ্নের ব্যাখ্যা গ্রহণ করা জরুরি নয়, ঐচ্ছিক।

৮. পীর সাহেব করেছেন তাই আমরাও করি। পীর সাহেব বলেছেন তাই আমরা করি। তিনি আল্লাহর অলি। তাঁর কাজ বা কথা বেঠিক হতে পারেনা।

এই কথাটি সরাসরি ইসলামের খেলাফ। এটা একজন মুসলিমের কথা হতে পারেনা। ইসলামের মূলনীতি হলো:

১. "কুরআন সুন্নাহ দ্বারা ব্যক্তিকে যাচই করতে হবে, ব্যক্তির কথা বা কাজ দ্বারা কুরআন সুন্নাহকে নয়।"

২. কুরআন সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক হলে পীর, দরবেশ, অলি, আলেম, শায়খ, সুফী, কর্তা সকলের কথা ও কাজই বর্জনীয়।

৩. সাহাবীগণও কুরআন সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক প্রমাণিত হলে নিজেদের মত পরিবর্তন করেছেন। যেমন: মোহরানা নির্ধারণের বিষয়ে খলিফা উমর রা. নিজের মত পরিবর্তন করেন।

৯. একদল লোক উসিলা ধরে দোয়া করে। তারা মনে করে : উসিলা ছাড়া আল্লাহ গুনাহগারদের দোয়া কবুল করেন না, গুনাহ মাফ করেন না। -এ ধারণা কি ঠিক?

এ ধারণা ঠিক নয়। কুরআন মজিদে আল্লাহ দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন। নবীগণের দোয়াও কুরআনে উল্লেখ হয়েছে। কিন্তু উসিলা ধরে দোয়া করার কোনো উল্লেখ নেই।

হাদিস গ্রন্থাবলীতে দেখুন রসূলুল্লাহ সা.-এর অসংখ্য দোয়া উল্লেখ হয়েছে। কোথাও তিনি উসিলা ধরে দোয়া করেন নাই।

উসিলা ধরে দোয়া করার নির্দেশ আল্লাহও দেন নাই, আল্লাহর রসূলও এধরণের শিক্ষা দেন নাই। সাহাবীগণ কখনো উসিলা ধরে দোয়া করেন নাই।

একমাত্র ইস্তিস্কার (পানি প্রার্থনার) দোয়া এর ব্যতিক্রম।

কুরআন মজিদে সবাইকে সরাসরি আল্লাহর কাছে দোয়া করতে বলা হয়েছে:

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

অর্থ: তোমাদের প্রভু বলেছেন: তোমরা আমাকে ডাকো-আমার কাছে দোয়া করো, আমি তোমাদের দোয়া কবুল করবো। (সূরা ৪০আল মুমিন : আয়াত ৬০)

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

অর্থ: আমার দাসেরা যখন তোমাকে আমার বিষয়ে প্রশ্ন করে, (তুমি তাদের বলো:) আমি তাদের একেবারে কাছেই আছি। আমি প্রার্থনাকারীর ডাকে সাড়া দিই-যখনই সে আমাকে ডাকে। (সূরা ২ বাকারা : আয়াত ১৮৬)

তবে নিজের কোনো নেক আমলের উল্লেখ করে আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়া যেতে পারে।

১০. কিছু লোক কুরআনের আয়াত 'ওয়াবতাগু ইলাইহিল ওসিলার' উল্লেখ করে বলে: উসিলা মানে পীর বুযুর্গ ধরা।' তারা আরো বলে: 'বিপদ মুসিবত, দু:খ কষ্ট দূর করা ও আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে এইসব উসিলার সাহায্য নিতে হবে। এসব কাজে তাদের অনেক ক্ষমতা।' এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা মরা ও জীবিত ব্যক্তিদেরকে উসিলা ধরে এবং তাদের কাছে দোয়া প্রার্থনা করে, ফরিয়াদ করে এবং তাদের কাছে মুক্তি চায়। -এ বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভংগি কী?

এ প্রসঙ্গে প্রথম কথা হলো, দোয়া হচ্ছে ইবাদত। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন:

اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ : অর্থ: 'দোয়া হচ্ছে ইবাদত।' (মিশকাত : দোয়া অধ্যায়)

اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ : অর্থ: 'দোয়া হলো ইবাদতের মস্তিষ্ক (অর্থাৎ মূল)।' (মিশকাত : দোয়া অধ্যায়)

সুতরাং যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদের কাছে দোয়া প্রার্থনা করে, ফরিয়াদ করে, এবং যা আল্লাহর কাছে চাওয়ার তা তাদের কাছে চায়, তারা সরাসরি শিরকে লিপ্ত। তারা অন্যদেরকে আল্লাহর সমকক্ষ বানাচ্ছে এবং তাদের ইবাদত করছে।

ওয়াবতাগু ইলাইহিল ওসিলার অর্থ পীর বুযুর্গ ধরতে হবে, এমন কথা যারা বলে, তারা কুরআন সম্পর্কে অজ্ঞ এবং কুরআনকে নিজেদের দুনিয়াবি স্বার্থে ব্যবহার করে।

উসিলা শব্দটি কুরআন মজিদে দুই জায়গায় উল্লেখ হয়েছে। তা হলো:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

অর্থ: হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং তাঁর নৈকট্য লাভের উসিলা (উপায়) অন্বেষণ করো, আর তাঁর পথে জিহাদ করো (প্রচেষ্টা চালাও), যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো। (সূরা ৫ আল মায়িদা : আয়াত ৩৫)

এ আয়াতে উল্লেখিত 'উসিলা অন্বেষণ করো' অর্থ কী? এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত সাহাবী ইবনে আব্বাস রা. বলেন:

اَلْوَسِيلَةُ اَيْ اَلْقُرْبَةُ : "উসিলা মানে-নৈকট্য।" (তফসির ইবনে কাছির)

প্রখ্যাত তাবেয়ী কাতাদা (রহ.) বলেন: اَيْ تَقَرَّبُوْا اِلَيْهِ بِطَاعَتِهِ وَالْعَمَلِ بِمَا يَرْضِيْهِ

"উসিলা অন্বেষণ করো মানে : আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করো তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে এবং এমন উত্তম আমলের মাধ্যমে, যে ধরণের আমল দ্বারা তিনি সন্তুষ্ট হন।" (তফসির ইবনে কাছির)

উসিলা শব্দটি সূরা বনি ইসরাঈলেও এসেছে। সেখানে আল্লাহ পাক বলেন:

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا • أُولَـٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا •

অর্থ: হে নবী! তাদের বলো: "তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর যাদের কাছে বিপদ মুসিবত ও দু:খ কষ্ট দূর করার জন্যে) দোয়া-প্রার্থনা-ফরিয়াদ করো, দু:খ ও বিপদ মুসিবত দূর করার কোনো ক্ষমতা তাদের নাই। এরা যাদের কাছে প্রার্থনা করে তারা নিজেরাই তো তাদের প্রভুর নৈকট্য লাভের উসিলা সন্ধান করে, এ উদ্দেশ্যে যে, কে তাঁর কতো নৈকট্যে যেতে পারে, তারাও তাঁরই

রহমত প্রত্যাশা করে এবং তাঁর শাস্তির ভয়ে ভীত থাকে। কারণ তাঁর শাস্তি যে অতিশয় ভয়াবহ।" (সূরা ১৭ বনি ইসরাঈল : আয়াত ৫৬-৫৭)

এ আয়াতগুলোতে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্যে এবং বিপদ মুসিবত ও দু:খ কষ্ট দূর করার জন্যে মরা বা জীবিত ব্যক্তিদের উসিলা বানাতে কুরআন সুস্পষ্টভাবে নিষেধ করেছে। বলা হয়েছে:

১. তারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে আল্লাহর শরিক ও সমকক্ষ বানাচ্ছে।
২. তারা যাদেরকে উসিলা বানায়, বিপদ মুসিবত ও দু:খ কষ্ট দূর করতে তারা সম্পূর্ণ অক্ষম ও অসহায়।
৪. তারা নিজেরাই আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্যে উসিলা খোঁজে।
৫. উসিলা মানে-আল্লাহর আনুগত্য ও নেক আমল, যা আল্লাহর নৈকট্য ও দয়া লাভের উপায়।

১৮. অলি আল্লাহদের জীবন মৃত্যু সমান কথা। আসলে অলি আল্লাহরা মরেনা, তারা কবরে জীবিতই আছে। তাদের কাছে ফরিয়াদ করে, দোয়া প্রার্থনা করে, তাদেরকে এবং তাদের কবরকে সাজদা করে তাদেরকে খুশি করতে পারলে সব গুনাহ মাপ পাওয়া যাবে। তারা সুপারিশ করে পার করে নেবে।

নবী, অলি, বুযুর্গ ও পীরের মৃত্যু আর সাধারণ মুসলমানের মৃত্যুতে কোনো পার্থক্য নাই। মৃত্যু মৃত্যুই। মত্যুর পর দুনিয়ার সাথে সকলেরই সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। মৃত লোকেরা জীবিত লোকদের জন্যে কিছুই করতে পারেনা। করার কোনো ক্ষমতাই তাদের থাকেনা।

রসূলুল্লাহ সা.-এর মৃত্যু সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন : اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ

অর্থ: (হে মুহাম্মদ!) নিশ্চয়ই তোমার মৃত্যু হবে এবং তাদেরও মৃত্যু হবে। (সূরা ৩৯ যুমার : আয়াত ৩০)

রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: 'দোয়া ইবাদত'। বরং 'দোয়া ইবাদতের মস্তিষ্ক।' আর সাজদা করাতো বরং শ্রেষ্ঠ ইবাদত।

সুতরাং মৃত কিংবা জীবিত অলি, পীর, বুযুর্গদের কাছে ফরিয়াদ করা, প্রার্থনা করা, তাদের কবরে কান্নাকাটি করে কিছু চাওয়া এবং তাদেরকে ও তাদের কবরে সাজদা করার অর্থ তাদের ইবাদত করা।

এসব কাজ অকাট্য শিরক।

আল্লাহর রসূলের প্রতিপক্ষ মুশরিকরা একাজই করতো। এ জন্যেই তাদেরকে মুশরিক বলা হতো।

যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদের কাছে প্রার্থনা ফরিয়াদ করে সেই মুশরিকদের ভ্রান্ত ধারণা কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে :

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ

অর্থ: যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে অলি হিসেবে গ্রহণ করেছে, তারা বলে: "আমরা (এই অলিদের) ইবাদত করি শুধু এই উদ্দেশ্যে যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটে পৌঁছে দেবে।" (সূরা ৩৯ যুমার : আয়াতাংশ ৩)

সুতরাং এরা এবং ঐ মুশরিকরা একই মুশরিক -যারা আল্লাহর রসূলের তাওহীদের দাওয়াত গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিল।

পার্থক্য শুধু এতোটুকু যে, তারা বলতো আমরা ইবরাহিমের ধর্মের উপর আছি। আর এরা বলে: আমরা মুহাম্মদের ধর্মের উপর আছি।

১২. দ্বীনদারি ও বুযুর্গি প্রদর্শনের জন্যে খেতাব বা উপাধি গ্রহণ করা কি বৈধ?

আমাদের এ অঞ্চলে দীনদারি ও বুযুর্গি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে খেতাব আর উপাধির ছড়াছড়ি দেখা যায়। এসব উপাধি গ্রহণের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি আর সীমালংঘনের কোনো সীমা নাই। যেমন:

অলিয়ে কামেল, আশেকে রসূল, মাহবুবে সোবহানী, কুতুবে রব্বানী, মুজাদ্দিদে যামান, অলিকুল শিরোমনি, গাউছ, গাউসুল আযম, ইমাম আযম, মুহিউস সুন্নাহ, ইমামুল আয়িম্মাহ, কুতুবে এরশাদ, হুজুর কেবলা, খাজা বাবা, গাউসুস সাকালাইন, হাদিয়ে যামান, মাহবুবে এলাহী ইত্যাদি।

এসবগুলোই দীনদারি, বুযুর্গি, শ্রেষ্ঠত্ব, পাপীদের মুক্তিদাতা ইত্যাদি বুঝানোর জন্যে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

প্রথম কথা হলো এসবই সুন্নতের খেলাফ।

আল্লাহর রসূল সা. এ ধরণের কোনো উপাধি গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সাহাবীরাও তাঁকে এ ধরণের উপাধিতে ডাকেননি।

দ্বিতীয় কথা হলো, এই উম্মতের শ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন সাহাবায়ে কিরাম। স্বয়ং আল্লাহ পাক তাদেরকে ক্ষমার ও জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন।

তাঁরা কেউ এ ধরণের উপাধি গ্রহণ করেননি। তাঁরা পরস্পরকে এ ধরণের উপাধি দেননি।

উম্মতের শ্রেষ্ঠ বুযুর্গগণ এ ধরণের উপাধি গ্রহণ করেননি। তাবেয়ী, তাবে তাবেয়ী, ইমাম আবু হানিফা, শাফেয়ী, আহমদ, মালেক কেউ এ ধরণের উপাধি গ্রহণ করেননি।

দেখা যায়, জীবদ্দশাতেই এখন বহু লোক এসব উপাধি গ্রহণ করে। আবার অনেক ভালো লোককে মৃত্যুর পর লোকেরা এসব উপাধিতে ভূষিত করে। এসব উপাধির মধ্যে শিরক পর্যন্ত আছে।

তাহলে প্রশ্ন হলো, এ ধরণের উপাধি কাদের প্রয়োজন? জবাব একটাই, তাহলো: যাদের কোনো স্বার্থ বা গরজ আছে, তাদেরই এ ধরণের উপাধি প্রয়োজন।

একটু ভাবলেই দেখা যায়, সুন্নতের খেলাফ হওয়া সত্ত্বেও এ ধরণের উপাধি গ্রহণ বা প্রদান করে সাধারণত:

১. জাহিল লোকেরা,
২. মতলব বাজ ও স্বার্থান্বেষী লোকেরা,
৩. ইসলামের নাম ব্যবহারকারী ধোকাবাজ লোকেরা।

এসব উপাধি দ্বারা মুসলিম জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করা হয়। এপ্রসংগে আল্লাহ পাক বলেন:

فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ

অর্থ: সুতরাং তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে শুদ্ধতার সার্টিফিকেট দিওনা। তিনিই অধিক জানেন- কে প্রকৃত মুত্তাকি।' (সূরা ৫৩ আন নাজম : আয়াত ৩২)

১৩. বলা হয়: আবদুল কাদের জিলানী গাউসুল আযম। মায়ের গর্ভে থাকতেই কুরআন মুখস্ত করেছেন। মেরাজে সিদরাতুল মুনতাহার পরে নবীকে অভয় দিয়েছেন-এগুলো কি ঠিক?

এ কথাগুলো থেকে বুঝা যায়, আবদুল কাদের জিলানি মানুষ ছিলেন না। কারণ এসব কথা মানব গুণাবলীর মধ্যে পড়েনা। এগুলো নিতান্তই জাহিল লোকদের কথাবার্তা যাদের মানবত্ব সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই।

গাউছ মানে-ত্রাণকর্তা, পরিত্রাণদানকারী, উদ্ধারকারী। আর গাউসুল আযম মানে-সর্বশ্রেষ্ঠ ত্রাণকর্তা।

গাউছ কথাটি আল্লাহ ছাড়া আর কারো জন্যে ব্যবহার করা উচিত নয়। কারণ তাহলে তা হবে শিরকের নামান্তর। আবদুল কাদের জিলানি কখনো নিজেকে

গাউছ বা গাউছুল আযম দাবি করেন নাই। পরবর্তীকালে জাহিল লোকেরা তাঁকে এই উপাধি দিয়েছে।

আর বাকি বিষয়গুলো তো কোনো মানুষের জন্যে প্রযোজ্য নয়। আবদুল কাদের জিলানি তো নস্যি, স্বয়ং নবীর কাছে এ ধরনের অনেক অলৌকিক বিষয় দাবি করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি বলেছেন, আমিতো মানুষ, আমার পক্ষে এগুলো করে দেখানো সম্ভব নয়। দেখুন কুরআন কী বলে:

وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا • أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا • أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا • أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ ۗ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا •

অর্থ: (কাফির মুশরিকরা) বলে: আমরা কখনো তোমার প্রতি ঈমান আনবোনা, যতোক্ষণ না তুমি ভূমি থেকে আমাদের জন্যে একটি ঝরণাধারা উৎসারিত করবে, অথবা তোমার খেজুর ও আংগুরের একটি বাগান হবে, যার ফাঁকে ফাঁকে তুমি অনেক নদী নালা, ঝরণাধারা প্রবাহিত করে নেবে, অথবা তুমি যেমন বলে থাকো, সে অনুযায়ী আকাশকে খণ্ডবিখণ্ড করে আমাদের উপর ফেলবে, অথবা আল্লাহকে এবং ফেরেশতাদেরকে আমাদের সম্মুখে এনে উপস্থিত করাবে, অথবা তোমার স্বর্ণ দ্বারা নির্মিত একটি ঘর হবে, অথবা তুমি আকাশে আরোহন করবে, কিন্তু তোমার ঐ আরোহনকে আমরা ততোক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বাস করেবো না, যতোক্ষণ না তুমি ওখান থেকে আমাদের প্রতি একটি কিতাব নাযিল করবে যা আমরা পাঠ করবো। (হে নবী!) তুমি বলো: অতিশয় পবিত্র ও মহান আমার প্রভু! আমি কি একজন মানুষ রসূল ছাড়া আর কিছু? (সূরা ১৭ ইসরা: আয়াত ৯০-৯৩)

১৪. অনেক লোক নিজের আখিরাতের মুক্তির প্রচেষ্টা ছেড়ে দিয়ে পীর অলির শাফায়াতের আশায় মনগড়াভাবে তাদের খুশি করার চেষ্টা করছে। -এতে কি কোনো ফল পাওয়া যাবে?

প্রশ্ন হলো, যার শাফায়াতে পার পাওয়ার আশায় আপনি বুক বেঁধে আছেন, তার মুক্তির ব্যবস্থা করবে কে? তার বেহেশত কি নিশ্চিত? কে দিলো আপনাকে এই নিশ্চয়তা?

ব্যাপারটা মনে হয় যেনো এমন যে, আপনার পীর অলির বেহেশতের নিশ্চয়তা দিচ্ছেন আপনি, আর আপনার মুক্তির দায়-দায়িত্ব পীরের বা অলির!

মুক্তির এই সহজ সুন্দর ব্যবস্থা থাকতে মানুষ আল্লাহর কিতাব এবং নবীর অনুসরণের ঝামেলা পোহাতে যাবে কেন?

শাফায়াতের উদ্দেশ্যে মৃত কিংবা জীবিত লোকদের সাজদা করা, তাদের কাছে প্রার্থনা করা, ফরিয়াদ করা, মান্নত করা, তাদেরকে উসিলা ধরা, তাদেরকে ধ্যান করা -এসবই শিরক। আপনি নিজের মুক্তির ব্যবস্থা নিজে না করলে তারা আপনার কোনোই উপকার করতে পারবে না:

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَـٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ ۚ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۚ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ •

অর্থ: তারা আল্লাহ ছাড়া আর যাদের ইবাদত করে, সেদিন তারা তাদের ক্ষতিও করতে পারবে না, উপকারও করতে পারবে না। তারা বলে: 'আল্লাহর কাছে এরা আমাদের শাফায়াতকারী।' হে নবী বলো: তোমরা কি আল্লাহকে আকাশ ও পৃথিবীর এমন কিছু সংবাদ দিচ্ছো, যা তিনি জানেন না? তিনি পবিত্র, তারা তাঁর সাথে যাদের শরিক করে তাদের থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বে। (সূরা ১০ ইউনুস: আয়াত ১৮)

মনে রাখবেন, আপনার অলি আর পীর তো দূরের কথা, সেদিন জিবরাঈল পর্যন্ত আল্লাহর অনুমতি ছাড়া টু শব্দটি করতে পারবে না:

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا ۖ لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَـٰنُ وَقَالَ صَوَابًا

অর্থ: সেদিন রূহ (জিবরিল) এবং সকল ফেরেশতা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। দয়াময় রহমান যাকে অনুমতি দেবেন, সে ছাড়া কেউই টু শব্দটিও করতে পারবে না। আর অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি যা বলবে একেবারে ন্যায় ও ন্যায্য কথা বলবে। (সূরা ৭৮ আন নাবা: আয়াত ৩৮)

وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ

অর্থ: তারা (অনুমতি প্রাপ্তরা) সুপারিশ করবে শুধু ঐসব লোকদের জন্যে যাদের প্রতি তিনি (আল্লাহ) সন্তুষ্ট, আর তারা নিজেরাই তো তাঁর ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত থাকেব। (সূরা ২১ আম্বিয়া: আয়াত ২৮)

১৫. অনেকে মনে করে, কেরামতি প্রদর্শন করা অলি আল্লাহ্ হবার প্রমাণ - এটা কি সঠিক?

এটা একেবারেই ভ্রান্ত কথা! কেরামতির সাথে অলি আল্লাহর কি সম্পর্ক?

সাহাবীগণ, তাবেয়ীগণ, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ, ইমাম মালেক, ইমাম মুহাম্মদ, আবু ইউসুফ, ইমাম বুখারি, ইমাম মুসলিম তাঁরা কেউই কেরামতি প্রদর্শন করেন নাই।

মুসলিম উম্মতের মধ্যে এদের চাইতে বড় বুযুর্গ বা অলি আর কেউ আছে কি?

কেরামতি প্রদর্শন করে বুযুর্গি প্রমাণ করা আল্লাহর রসূলের সুন্নত নয়।

কেরামতির নামে সমাজে অনেক বানোয়াট কাহিনী প্রচলিত আছে। এগুলোতে কান দেয়া ঈমানদারের বৈশিষ্ট্য নয়।

১৬. দরগাহ্ এবং মাযারের মধ্যে পার্থক্য কি? দরগাহ্ এবং মাযারকে শরিফ বলা যাবে কি? যেমন দরগাহ্ শরিফ, মাযার শরিফ। দরগাহ্ এবং মাযারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা জায়েয আছে কি?

দরগাহ্ ফারসি শব্দ। মাযার আরবি শব্দ। উভয় শব্দের একই অর্থ। অর্থাৎ পরিদর্শনের স্থান, দর্শণীয় স্থান, রাজসভা। -এগুলো হলো আভিধানিক অর্থ।

প্রচলিত অর্থে দরগাহ্ এবং মাযার মানে- বুযুর্গ বা পুণ্যবান ব্যক্তির সমাধি।

আমাদের উপমহাদেশে যে কোনো কিছুর সাথে 'শরিফ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। শব্দটি ব্যবহার করা একটা বাতিকে পরিণত হয়েছে।

শরিফ মানে-মর্যাদাবান, সম্মানার্হ, অভিজাত, ভদ্র।

সাধারণত কোনো কিছুর সাথে 'শরিফ' কথাটি জুড়ে দেয়া হয় শ্রদ্ধা এবং সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে।

তাই কোনো কোনো ক্ষেত্রে 'শরিফ' প্রয়োগ করা জায়েয। যেমনঃ কুরআন শরিফ, কাবা শরিফ, হারাম শরিফ, হাদিস শরিফ, খানকা শরিফ।

উল্লেখিত ক্ষেত্র সমূহে যেরূপ সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রকাশার্থে শরিফ শব্দটি ব্যবহার করা হয়, অনুরূপ ভক্তি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনার্থে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে শরিফ শব্দ প্রয়োগ একেবারে না জায়েয। যেমনঃ মাযার শরিফ, দরগাহ্ শরিফ, উরস শরিফ, আজমীর শরিফ।

এর কারণ হলো, ইসলামে প্রথমোক্তগুলো ঈমান, আকিদা এবং কুরআন সুন্নাহর ভিত্তিতেই সম্মানার্হ। কিন্তু শেষোক্তগুলোর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ করা ঈমান আকিদার সাথে সাংঘর্ষিক। বরং অনেক ক্ষেত্রেই শিরক।

১৭. দেখা যায়ঃ কিছু লোক মৃত পীর বা অলি বুযুর্গের নাম ধরে ডেকে বা তাদের কবরে গিয়ে তাদের কাছে সন্তান প্রার্থনা করে, সমস্যা ও বালা মুসিবত দূর করার প্রার্থনা করে। -এসব ব্যাপারে ইসলামের বক্তব্য কি?

এসব কাজ যারা করে, তারা মৃত ব্যক্তিদেরকে জীবিত মনে করে এবং খোদায়ী ক্ষমতার অধিকারী বলে ধারণা করে।

সুতরাং একাজ অকাট্য শিরক।

ইসলামি দৃষ্টিভংগি হলো- মৃতরা মৃতই। তারা কারো কোনো লাভ বা ক্ষতি করতে পারেনা। আর কোনো মানুষই খোদায়ী ক্ষমতার অধিকারী নয়। দোয়া, প্রার্থনা, ফরিয়াদ সরাসরি শুধুমাত্র আল্লাহর কাছেই করতে হবে এবং কেবল তাঁর কাছেই চাইতে হবে।

১৮. অনেকে মৃত ব্যক্তিদের জন্যে দাঁড়িয়ে নিরবতা পালন করে। এটা ইসলামের দৃষ্টিতে কেমন?

মৃত ব্যক্তিদের জন্যে দাঁড়িয়ে নিরবতা পালন করা ইসলামি রীতি নয়। এটা অন্য ধর্মের রীতি।

কোনো মুসলিম অন্য ধর্মের রীতি অনুসরণ করতে পারেনা।

ইসলাম মৃত ব্যক্তিদের প্রতি কর্তব্য পালনের সুস্পষ্ট বিধান দিয়েছে। তাহলো-

- তাদের জন্যে দয়াময় আল্লাহর কাছে দোয়া করা, ক্ষমা প্রার্থনা করা।
- তাদের উত্তম কর্মসমূহের প্রশংসা করা এবং অনুসরণ করা।
- তাদের কথা স্মরণ হলে নিজের মৃত্যুর কথা স্মরণ করা।
- তাদের আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবদের সাথে ভালো ব্যবহার করা।

১৯. বলা হয়ঃ আমাদের নবী নূরের তৈরি। তাঁকে সৃষ্টি করা না হলে বিশ্ব জগতই সৃষ্টি করা হতো না। সর্বপ্রথম তাঁর নূর সৃষ্টি করা হয়েছে। -এসব কথা কি সঠিক?

এসব কথা প্রচার করার জন্য জাল এবং বানোয়াট হাদিস তৈরি করা হয়েছে।

এসব কথার সাথে মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সা. এবং তাঁর সৃষ্টি ও জগত সৃষ্টির কোনো সম্পর্ক নেই।

সাধারণ ওয়ায়েযরা তাহকিক না করেই এসব কথা বলে বেড়ায়।

কুরআন বলছেঃ আদম এবং আদম সন্তানরা সকলেই মাটির তৈরি। (সূরা ৩০ আর রূম : আয়াত ২০)

মাটিতে যদি নূর থেকে থাকে,তবে তা আদম, ইবরাহিম, মূসা, মুহাম্মদ এবং অন্যান্য আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের মধ্যেও ছিলো। তেমনি নমরূদ, ফেরাউন, আবু জেহেল এবং অন্যান্য চরম আল্লাহদ্রোহীদের মধ্যেও ছিলো। কারণ সকল মানুষের সৃষ্টিগত উপাদান একই। (সূরা ৭৬ আদ দাহারঃ আয়াত ২)

কুরআন বলছেঃ সর্বপ্রথম আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তারপর তার থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে সকল মানুষকে। (সূরা ৪ আন নিসাঃ আয়াত ১)

সুতরাং সর্বপ্রথম মুহাম্মদ সা.-কে নয়, আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

বিশ্বজগত সৃষ্টির সাথে মুহাম্মদকে সৃষ্টি করার কোনোই সম্পর্ক নাই। মানুষ সৃষ্টির লক্ষ কোটি বছর আগেই বিশ্বজগত সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং এসব কথাই কুরআনের বিরোধী,মিথ্যা এবং বর্জনীয়।

২০. মিলাদে বলা হয়-মুহাম্মদ সা.-এর ভূমিষ্ট হবার সময় তাঁর মায়ের কাছে বিবি আছিয়া ও বিবি মরিয়ম হাযির হয়েছিলেন-একথা কতোটা সত্য?

একথা ঘোড়ার ডিমের মতোই সত্য।

যারা এ ধরণের অজ্ঞতার মিলাদ পড়েন, তাদের মুর্খতার জন্যে শয়তানের আনন্দের ইয়ত্তা নেই।

মরা মানুষদের প্রতি অলৌকিক ক্ষমতা আরোপকারীরা শয়তানের শিষ্য শাগরেদ।

২১. কিছু লোক বলে বেড়ায় নবী এবং অলীগণ গায়েব জানেন। -এ ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভংগি কি?

নবীগণ যে গায়েব জানতেন না-সেকথা কুরআন মজিদে অকাট্যভাবে বলে দেয়া হয়েছে এবং বার বার বলা হয়েছে।

সর্বশেষ নবী, বিশ্বনবী মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.-এর অবস্থা লক্ষ্য করুন। মহান আল্লাহ বলেনঃ

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ

অর্থঃ হে নবী! তাদের বলোঃ "আল্লাহ যা চান তাছাড়া আমার নিজের ভালো মন্দের বিষয়টিও আমার ক্ষমতার মধ্যে নাই। আমি যদি গায়েব জানতামই, তবে তো আমি নিজের প্রভুত কল্যাণ সাধন করে নিতাম এবং কোনো মন্দই আমাকে স্পর্শ করতোনা।" (সূরা ৭ আ'রাফ : আয়াত ১৮৮)

এবার ভেবে দেখুন, এই যদি হয় আল্লাহর রসূলের গায়েব জানার অবস্থা, তবে তাঁর তুলনায় অলি, বুযুর্গ, পীর দরবেশরা কোন্ খানে।

গায়েব শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যে নির্ধারিত। রসূল সা. যা কিছু বলেছেন সবই অহির মাধ্যমে বলেছেন।

২২. অনেকে পৃথিবীকে 'বিশ্ব ব্রহ্মান্ড্য' বলে। -এটা কি বলা যায়?

এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী কোনো ব্যক্তি কোনো অবস্থাতেই পৃথিবীকে ব্রহ্মান্ড্য' বলতে পারেন না। কারণ, এটা একটা শিরকি আকিদা।

ব্রহ্মান্ড্য মানে-ব্রহ্মা দেবীর ডিম। হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী শিবের সাথে অবৈধ মিলনের ফলে ব্রহ্মা গর্ভবতী হয়ে পড়ে। তখন এজগত ছিলো মহাসমুদ্র। ব্রহ্মা তার গর্ভ প্রসবের সময় মহা সমুদ্রের মাঝখানে একটা বিশাল আন্ডা প্রসব করে।

ব্রহ্মার সেই আন্ডার নামই ব্রহ্মান্ড্য- যাকে পৃথিবী বলা হয়। হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী পৃথিবী হলো সেই ব্রহ্মান্ড্য।

জানিনা, আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানে শিক্ষিত হিন্দু পন্ডিতরা এখনো এই বিশ্বাস ধারণ করেন কিনা?

তবে কিছু মুসলমান না জেনে বুঝেই পৃথিবীকে ব্রহ্মান্ড্য বলে থাকেন।

২৩. আপনি কেমন আছেন? জবাবে বলা হয় : আল্লাহ রসূলের দোয়ায় ভালো আছি। পীর আওলিয়ার দোয়ায় ভালো আছি। আপনার/আপনাদের দোয়ায় ভালো আছি।

এই সবগুলো জবাবই ভুল। আপনি কারো দোয়ায় ভালো আছেন কিনা-তাতো আপনি জানেন না। -সুতরাং জবাব সত্য নয়।

আপনি মূলত আল্লাহর দয়া ও রহমতে ভালো আছেন, তাই বলুন: 'আলহামদুলিল্লাহ' আমি ভালো আছি।

'আল্লাহর দোয়ায় ভালো আছি' একথাটাও ঠিক নয়, সঠিক হলো: আল্লাহর রহমতে ভালো আছি।

২৪. আমি নিজ চোখে দেখেছি একজন পীরকে তার অনুসারীরা সাজদা করে, উপুড় হয়ে তার পায়ে চুমু খায় এবং কান্নাকাটি করে তার কাছে প্রার্থনা করে। -এ সম্পর্কে ইসলাম কী বলে?

আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেও সাজদা করা নিষিদ্ধ। অনেকে বলেন, সম্মানার্থে সাজদা জায়েয। তারা কুরআনের ভুল ব্যাখ্যা করেন এবং মনগড়া কথা বলেন।

সম্মানার্থে যদি কাউকেও সাজদা করা জায়েয হতো, তাহলে সাহাবীগণ আল্লাহ্‌র রসূলকে সাজদা করতেন। কারণ মানুষের মধ্যে তাঁর চাইতে অধিক সম্মান পাওয়ার যোগ্য আর কে?

মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.-এর শরিয়তে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেও সাজদা করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। -একাজ শিরক।

সাজদা শুধুমাত্র আল্লাহকেই করতে হবে: فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا

অর্থ: সুতরাং কেবল আল্লাহকে সাজদা করো এবং কেবল তাঁরই ইবাদত করো। (আল কুরআন, সূরা আন নজম : আয়াত ৬২)

রসূল সা. কেও সাজদা করার প্রস্তাব করা হয়েছিল। তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন, নিষিদ্ধ করেন। তিনি বলেন: "মানুষকে সাজদা করা যদি বৈধ হতো তবে নারীকে নির্দেশ দিতাম তার স্বামীকে সাজদা করতে।"

২৫. বলা হয়: আদম আ. ভুল করার পর আল্লাহর আরশের নিচে আল্লাহর নামের পাশে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্‌র নাম দেখতে পান। তখন তিনি মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্‌র উসিলা ধরে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাইলে আল্লাহ তাকে মাফ করে দেন। -একথা কি ঠিক?

এসব কথা ভিত্তিহীন। হাদিসের নামে এসব বানানো কথা। একথাগুলো কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক।

আদম আ. ভুল করার সাথে সাথে অনুতপ্ত হন। কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাওয়ার ভাষা তাঁর জানা ছিলোনা। কুরআন বলছে, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে কিছু বাণী পৌঁছানো হয় এবং তিনি সেই বাণীগুলো উচ্চারণ করে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চান:

فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

অর্থ: তখন আদম তাঁর প্রভুর নিকট থেকে কয়েকটি বাণী প্রাপ্ত হন। (সে বাণী উচ্চারণ করে তাওবা করলে) আল্লাহ তাঁর তাওবা কবুল করেন। কারণ তিনি ক্ষমাশীল দয়ালু। (সূরা ২ বাকারা : আয়াত ৩৭)

সূরা আ'রাফে আল্লাহ্‌র নিকট থেকে প্রাপ্ত সেই কথাগুলো উদ্ধৃত হয়েছে। সে কথাগুলো শিখে নিয়ে আদম ও হাওয়া আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন:

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

অর্থ: আমাদের প্রভু! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় অবিচার করেছি। এখন তুমি যদি আমাদের ক্ষমা না করো এবং আমাদের প্রতি দয়া না করো, তবে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বো। (সূরা ৭ আ'রাফ : আয়াত ২৩)

আদম আলাইহিস সালামের সেই দোয়া সুস্পষ্টভাবে কুরআনে উদ্ধৃত হয়েছে। কিন্তু তাতে কাউকেও উসিলা বানিয়ে দোয়া করা হয়নি।

সুতরাং তাঁর উসিলা ধরে দোয়া করার বিষয়টি একেবারেই ভ্রান্ত, মনগড়া কথা।

২৬. আমাদের এলাকায় মাঝে মধ্যে এক লেংটা পীর আসে। তার পরনে এক দেড় ইঞ্চি পাশের একটি লেংটি থাকে মাত্র। তার মধ্যে নাকি বিরাট মাজেযা আছে। তার থেকে ফু ইত্যাদি নেয়ার জন্যে তার কাছে নারী পুরুষের ভীড় জমে যায়। সত্যি কি এ ধরণের লোকদের মধ্যে কোনো মাজেযা আছে?

তার মধ্যে মাজেযা যতোটুকু ছিলো, সবটা তো সে প্রকাশই করে দিয়েছে। আর লেংটির ভেতর কি আছে তাতো সবাই জানে। এই লেংটি আর লেংটির ভেতর যা আছে তার বাইরে কোনো মাজেযা তার কাছে নেই।

ঐ লোকটা একটা নিকৃষ্ট লম্পট ছাড়া আর কিছুই নয়। সে মুসলিম তো নয়ই, সে মানুষের সংজ্ঞায়ও পড়েনা। সে পশুর চাইতেও অধম। এরা সমাজে বের হলে এদের পেটানো উচিত।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থার উচিত এদের বস্ত্র পরতে বাধ্য করা, নইলে বন্দি করে রাখা।

২৭. কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা কি বৈধ?

কবর যিয়ারতের অনুমতি ইসলামি শরিয়তে আছে। রসূল সা. মুমিনদেরকে নিজের মৃত্যুর কথা স্মরণ করার উদ্দেশ্যে কবর যিয়ারতের অনুমতি দিয়েছেন।

তবে কোনো নবী, অলি, বুযুর্গ ব্যক্তির কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা বৈধ নয়। রসূল সা. বলেছেন:

لاَ تَشُدُّوْا الرِّحَالَ الاَّ اِلى ثَلثَةِ مَسَاجِدِ ، مَسْجِدُ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِيْ هٰذَا وَالْمَسْجِد الْاَقْصٰى (بُخَارِىْ وَ مُسْلِم)

অর্থ: (সওয়াব, নেকী, ইবাদত ও আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে) তোমরা সফর করোনা; তবে শুধুমাত্র তিনটি মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা যাবে। সেগুলো হলো : ১. মসজিদুল হারাম, ২. আমার মসজিদ এবং ৩. মসজিদুল আকসা। (সহীহ বুখারি ও মুসলিম)

২৮. রূহানি ফয়েয কি? সাধারণত রূহানি ফয়েয লাভের উদ্দেশ্যে মৃত পীর বুযুর্গদের কবর যিয়ারত করা হয় এবং তাদেরকে ধ্যান করা হয়।

ফয়েয আরবি শব্দ। এর অর্থ: দয়া, দান, সমৃদ্ধি। রূহানি ফয়েয মানে- আত্মিক দয়া, দান ও সমৃদ্ধি।

যারা মৃত পীর বুযুর্গদের কবর থেকে, কিংবা তাদেরকে ধ্যানের মাধ্যমে তাদের থেকে রূহানি ফয়েয লাভ করার চেষ্টা করে, তারা সুস্পষ্ট গোমরাহিতে নিমজ্জিত। এ ধরনের ফয়েয হাসিলের কোনো ভিত্তি নেই। আল্লাহর রসূল সা. এবং সাহাবীগণ এ ধরনের ফয়েয হাসিল করার কোনো পথের সন্ধান দিয়ে যাননি। এটা বিদআত এবং শিরক।

২৯. রসূলের কবরে সালাম দেয়ার উদ্দেশ্যে মদিনায় যাওয়া কি জায়েয। অনেক হাজীই রসূলের কবরে সালাম দেয়ার উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে মদিনায় যান।

রসূলের কবরে সালাম দেয়ার উদ্দেশ্যে মদিনায় যাওয়া নিষেধ। এ সম্পর্কে যতো কথাই বলা হয়, সবই ভ্রান্ত মনগড়া কথা।

হজ্জ করতে গেলে মদিনা যাওয়া জরুরি নয়। মদিনায় যাওয়া হজ্জের অংশ নয়।

তবে যারা মদিনায় যান, তাদের উচিত মসজিদে নববীতে সালাত আদায়ের নিয়্যতে মদিনায় যাওয়া, অন্য কোনো নিয়্যতে নয়। নবীর কবর যিয়ারত, কবরে সালাম দেয়া, ফয়েয নেয়া, নবীর কাছে কিছু চাওয়া ইত্যাদি উদ্দেশ্যে মদিনায় যাওয়া ইসলামে নিষিদ্ধ।

৩০. কিছু কিছু লোকের কাছে গায়েবি ইলম আছে বলে প্রচার করা হয়। এটা কি সত্য?

এ কথা আবারো আমরা পরিষ্কার করে জানিয়ে দিচ্ছি, কুরআন সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে, আল্লাহ ছাড়া আর কেউই গায়েব জানে না:

• قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ •

অর্থ: হে নবী! বলো: মহাকাশ এবং এই পৃথিবীতে যারা আছে কেউই গায়েব জানে না আল্লাহ ছাড়া। এমনকি কখন তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে সেটাও তারা জানে না। (সূরা ২৭ আন নামল: আয়াত ৬৫)

৩১. ঈসা আ. যেহেতু নবী, সে জন্যে তাঁর ব্যাপারে আমাদের সঠিক আকিদা পোষণ করতে হবে। খৃস্টানরা যে তাকে আল্লাহর পুত্র বলে, সে কথা যে ডাহা মিথ্যা তা তো আমাদের কাছে পরিষ্কার। কিন্তু তাঁর ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর বিষয়টি কি সত্য?

ঈসা আ.-এর ক্রুশবিদ্ধ হবার বিষয়টি ডাহা মিথ্যা, যেমন তাঁর আল্লাহর পুত্র হবার বিষয়টি ডাহা মিথ্যা।

খৃষ্টানদের যে গোষ্ঠীটি ঈসা আ. ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন বলে প্রচার করে তারা নেহায়েতই অনুমানের ভিত্তিতে একথা প্রচার করে। ঈসা আলাইহিস সালামই যে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন একথা নিশ্চিত করে তারাও বলতে পারেনা।

এ সন্দেহের সুস্পষ্ট সমাধান দিয়েছে আল কুরআন। কুরআন বলে দিয়েছে:

وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا • وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَـٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ ۚ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا • بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا •

অর্থ: এবং তারা অভিশপ্ত হয়েছে তাদের কুফুরির কারণে মরিয়মের বিরুদ্ধে জঘন্য অপবাদ রটিয়ে, আর "আমরা আল্লাহ্র রসূল মরিয়ম পুত্র ঈসাকে হত্যা করেছি" একথা রটানোর কারণে। অথচ তারা তাকে হত্যাও করে নাই, ক্রুশবিদ্ধও করে নাই, কিন্তু তাদের এ রকম বিভ্রম হয়েছিল। যারা তার (ঈসার) সম্পর্কে মতভেদে লিপ্ত হয়েছিল, তারা অবশ্যি (তাকে হত্যার ব্যাপারে) সংশয়ে ছিলো। অনুমানের পিছে ছুটা ছাড়া এ বিষয়ে তাদের কোনো অবগতিই ছিলোনা। এটা নিশ্চিত যে, তারা তাকে হত্যা করে নাই। বরং আল্লাহ তাকে তাঁর নিকট তুলে নিয়েছেন এবং আল্লাহ কর্ম সম্পাদনে পরাক্রমশালী মহাকৌশলী। (সূরা ৪ নিসা : আয়াত ১৫৬-১৫৮)

৩২. কিছু লোক মনে করে রসূল সা. মিলাদ মাহফিলে উপস্থিত হন। -এ ধারণা কি ঠিক?

এটা নিতান্তই জাহেলি ধারণা। এই জাহেলি ধারণার ভিত্তিতে যদি কেউ বিশ্বাস করে যে, রসূল সা. মিলাদ বা অন্য কোনো মাহফিলে উপস্থিত হন, তবে এ ধারণা কুফুরি এবং শিরক।

ইসলামের সুস্পষ্ট আকিদা হলো, রসূল সা.-এর মৃত্যু হয়েছে। সকল মৃতদের মতোই তিনি মৃত। সকল মৃতদের মতোই তিনি পৃথিবীর সাথে সম্পর্ক রাখতে অক্ষম।

নিম্নোক্ত বিষয়গুলোও আকিদাগত বড় বড় ভ্রান্তি :

৩৩. কবরে বাতি দেয়া বিদআত এবং পাপ।

৩৪. কবরের মাটি গায়ে মাখা বিদআত ও শিরক।

৩৫. কবর তওয়াফ করা বিদআত এবং শিরক।

৩৬. কবরের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করা শিরক।

৩৭. আল্লাহ ছাড়া আর কারো উপাসনা এবং অর্চনা করা শিরক।

৩৮. অলি, বুযুর্গ, দরগাহ, মাযার ইত্যাদির নামে পশু মান্নত করা এবং কুরবানি করা শিরক।

৩৯. আল্লাহর আইনের বিপরীত আইন প্রণয়ন করা এবং পালন করা কুফুরি।

৪০. কাউকেও আল্লাহর সমতুল্য বা আল্লাহর চাইতে বেশি ভালোবাসা ফাসেকি।

৪১. আল্লাহ কোনো অলি, পীর বা বুযুর্গের কথা শুনতে বাধ্য- এ ধারণা পোষণ করা শিরক।

৪২. গণকগিরি করা শিরক।

কুরআন সংক্রান্ত ভ্রান্তি

৪৩. একজন কুরআনের আমলকারী হাফেয তার পরিবারের দশজন মানুষের জন্যে শাফায়াত করবে -একথা কি ঠিক?

একথাটি হাদিস গ্রন্থ সুনানে তিরমিযিতে উল্লেখ আছে। অধ্যায়: বাবু ফাদায়েলিল কুরআন।

একটি সূত্র থেকে ইমাম তিরমিযিকে জানানো হয়েছিল এটি নবীর হাদিস। কিন্তু সূত্রটি নির্ভরযোগ্য ছিলোনা।

তাই ইমাম তিরিমিযি তাঁর গ্রন্থে সূত্রসহ একথাটি উল্লেখ করার সাথে সাথে সূত্রটি যে জয়ীফ ও দুর্বল তাও বলে দিয়েছেন।

কিন্তু তারপরেও জাহিল এবং অবিবেচক লোকেরা একথাটিকে বিশুদ্ধ হাদিসের মতোই গ্রহণ করে এবং প্রচার করে।

৪৪. আমাদের দেশের সাধারণ মুসলমানগণ না বুঝেই কুরআন তিলাওয়াত করেন। অনেকেই প্রতিদিন কিছু অংশ তিলাওয়াত করেন, খতম করেন, এবং জীবনে বহুবার খতম করেন। অধিকাংশ হাফেযই না বুঝে কুরআন তিলাওয়াত করেন, খতম করেন, শবিনা পড়েন। না বুঝে কুরআন পড়ার মধ্যে কি কোনো সোয়াব আছে?

এক্ষেত্রে প্রথমেই দেখতে হবে কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য কী? কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্বয়ং কুরআনই বলেছে:

১. মানব জাতিকে অন্ধকার থেকে আলোতে আনা। (আল কুরআন ১৪:১)
২. মানব জাতিকে জীবন যাপনের সঠিক পথ প্রদর্শন। (আল কুরআন ১:১৮৫)
এই উদ্দেশ্যের দাবি হলো:

১. কুরআন বুঝা এবং
২. কুরআনের অনুসরণ করা।

কুরআন মজিদের সাথে মুমিনের যতো সোয়াব ও নেকি জড়িত সবই এই দুটির সাথে জড়িত। অর্থাৎ বুঝার সাথে এবং অনুসরণ করার সাথে।

যিনি না বুঝে কুরআন পাঠ করেন, তার উপমা হলো ঐ ব্যক্তির মতো, যিনি শুনেছেন রসূলুল্লাহ সা. আতর ভালোবাসতেন। তাই তিনি প্রতিদিন কিছু সময় আতরের দোকানে গিয়ে বসে আসেন। কিন্তু তিনি আতর কিনে ব্যবহার করেন না। ফলে তিনি প্রতিদিন কিছু সময় নিজে আতরের ঘ্রাণ পান। কিন্তু তার থেকে কেউ আতরের ঘ্রাণ পায় না। তিনি নিজেও সব সময় আতরের ঘ্রাণ পান না।

পক্ষান্তরে যিনি কুরআন বুঝেন এবং কুরআনের জ্ঞানার্জন করেন, তার চিন্তা, ধ্যান ধারণা এবং চরিত্র ও কর্মে সব সময় সেই জ্ঞান প্রস্ফুটিত ও বিকশিত থাকে। ফলে সর্বক্ষণ তিনি নিজেও সুরভিত থাকেন এবং অন্যেরাও তার সুবাসে সুবাসিত হন।

আমাদের দেশে যেসব নিরক্ষর বা স্বল্প শিক্ষিত নারী পুরুষ কুরআন তিলাওয়াত করতে শিখেন এবং নিয়মিত তিলাওয়াত করেন, কুরআনের প্রতি তাদের আগ্রহ, কুরআনেকে ভালবাসা এবং তিলাওয়াত করার কারণে তারা অবশ্যি সওয়াব পাবেন।

কিন্তু যেসব মুসলিম সময় শ্রম ও অর্থ ব্যয় করে শিক্ষিত হয়েছেন, বিভিন্ন ভাষা ও বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেছেন, জ্ঞান ও মেধা খাটিয়ে চাকরি কিংবা ব্যবসা করছেন, বেবুঝ কুরআন তিলাওয়াতের জন্য তাদের কিছু সোয়াব হলেও কুরআন বুঝার চেষ্টা না করার জন্যে, এবং এর জন্যে সময় শ্রম অর্থ ও মেধা নিয়োজিত না করার জন্যে তারা পাকড়াও থেকে রেহাই পাবেন কি?

৪৫. সাধারণত লোকেরা সওয়াব হাসিল এবং কুরআনের প্রতি সম্মান ও ভালোবাসা প্রকাশের উদ্দেশ্যে প্রতিদিন না বুঝে কুরআন তিলাওয়াত করে, সম্মানের সাথে চুমু খেয়ে মাথার উপর তাকে উঠিয়ে রাখে। এটা কি কুরআনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও কুরআন থেকে সওয়াব হাসিলের সঠিক পদ্ধতি? তা না হলে সঠিক পদ্ধতি কী?

এগুলো কুরআন থেকে সওয়াব হাসিল এবং কুরআনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের সঠিক পদ্ধতি নয়।

কুরআনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং কুরআন থেকে সওয়াব হাসিলের সঠিক পদ্ধতি হলো:

১. কুরআন মজিদ পাঠ করতে শিখা এবং নিয়মিত পাঠ করা।
২. কুরআন জানা এবং বুঝা।
৩. কুরআন মানা এবং অনুসরণ করা।
৪. যারা কুরআন জানে না তাদেরকে কুরআন শিক্ষা দান করা।
৫. মানুষকে কুরআনের দিকে আহ্বান জানানো।

৬. পরিবার, সমাজ, ব্যবসা বাণিজ্যসহ সকল ক্ষেত্রে কুরআনের বিধান প্রবর্তনের প্রচেষ্টা চালানো।

৪৬. একদল লোক কুরআনের অর্থ ও তফসির পড়তে নিষেধ করে। তারা বলে, কুরআন বুঝা সাধারণ লোকদের কাজ নয়, (বড় বড় আলেম উলামার কাজ)। তারা আরো বলে, সাধারণ লোকেরা কুরআনের অর্থ ও তফসির পড়লে বিভ্রান্ত হবে। -এসব কথা কি ঠিক?

এসব কথা সরাসরি কুরআনের বিরুদ্ধে এবং রসূলুল্লাহ সা.-এর সুন্নতের বিরুদ্ধে।

এসব কথা যদি কেউ বলে থাকে এবং যারাই বলে, অবশ্যি তারা বিভ্রান্তিতে আছে এবং শয়তানের ধোকায় পড়ে আছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

অর্থ: তারা কি কুরআন অনুধাবনের চেষ্টা করে না? নাকি তাদের দিলসমূহ তালাবদ্ধ? (সূরা মুহাম্মদ : ২৪)

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ

অর্থ: আমরা কুরআনকে বুঝার ও উপদেশ গ্রহণ করার জন্যে সহজ করে দিয়েছি। কেউ কি আছে উপদেশ গ্রহণকারী? (সূরা ৫৪ আল কামার: আয়াত ৪০)

রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সে, যে কুরআনের ইলম অর্জন করে এবং মানুষকে কুরআনের ইলম শিক্ষা দেয়।" (মিশকাত)

৪৭. অনেকে কুরআন লিখে তাবিজ বানায় এবং সে তাবিজ যেখানে সেখানে ব্যবহার করে। এটা কি জায়েয?

তাবিজ বানানোর জন্যে কুরআন নাযিল হয়নি। এটা রসূলুল্লাহ সা.-এর সুন্নতের খেলাফ। এ ধরনের কাজ তিনি করেনি। সাহাবীগণও করেননি।

মুমিনদেরকে এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকা উচিত।

৪৮. বাজার থেকে কুরআন শরিফ কিনে আনলে দেখা যায় অনেক কুরআন শরিফের শুরুতে তাবিজ লেখা আছে। এগুলো দেখে অনেক সাধারণ মানুষ মনে করে কুরআন শরিফ তাবিজ তুমারের কিতাব। অনেক ইমাম মুয়াজ্জিনও তাই মনে করে এবং তারা সেগুলো লিখে তাবিজ তুমার দেয়। -এসব কি বৈধ?

এগুলো বৈধ হবার প্রশ্নই উঠেনা।

যারা আল্লাহ্‌র কালামের শুরুতে তাবিজ লিখে ছাপিয়ে দিয়েছে, তারা জঘন্য পাপের কাজ করেছে।

তাবিজতি করার উদ্দেশ্যেই অনেকে ঐ প্রকাশকদের কুরআন শরিফগুলো কিনে। বেশি ব্যবসার উদ্দেশ্যেই তারা কুরআন শরিফে তাবিজ ছাপে।

এরা মূলত কুরআন দ্বারা ব্যবসা করে।

কুরআনে এদের কঠিন শাস্তির কথা উল্লেখ আছে। (দ্রষ্টব্য : সূরা আল বাকারা : আয়াত ১৭৪-১৭৫)

৪৯. লোকেরা সাধারণত অযু ও পবিত্রতা ছাড়া কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করে না এবং স্পর্শ করে না। -এটা কি সঠিক?

অযু ও পবিত্রতা ছাড়া কুরআন মজিদ পড়া এবং স্পর্শ করা যাবে না- একথার পক্ষে কুরআন হাদিসে কোনো বিশুদ্ধ দলিল নেই।

মুমিনদের তো সব সময়ই কুরআন মজিদ ধরা এবং পড়ার প্রয়োজন হয়। কুরআন মজিদ তো মুমিনদের জীবন যাপনের ম্যানুয়েল এবং গাইডবুক। সুতরাং তারা এক মুহূর্তও কুরআন থেকে দূরে থাকতে পারে না। কিন্তু সর্বক্ষণ অযু ও পবিত্রতা ধরে রাখা অত্যন্ত কঠিন, জটিল ও অস্বাভাবিক।

আর কুরআন মজিদ ধরা পড়ার জন্যে অযু এবং পবিত্রতা যদি জরুরিই হতো তবে আল্লাহ্ অবশ্যি কুরআন মজিদে তা বলে দিতেন, যেমন নামাযের জন্যে অযু ও পবিত্রতার কথা পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন (দ্রষ্টব্য সূরা আল মায়িদা আয়াত ৬)। রসূলুল্লাহ্ সা. নিজেও তাঁর সুন্নতের মধ্যে কুরআন পাঠ এবং স্পর্শ করার জন্যে অযু ও পবিত্রতার বিধান স্পষ্টভাবে জারি করতেন, যেভাবে করেছেন নামাযের জন্যে।

ফকীহগণ এ প্রসঙ্গে নিজস্বভাবে যেসব মতামত দিয়েছেন, তাতে তাদের মধ্যে প্রচণ্ড মতভেদ লক্ষ্য করা যায়।

অন্যদিকে আল কুরআন তো মুসলিম অমুসলিম সকল মানুষের কিতাব।

অমুসলিম ও মুশরিকরা কুরআন ধরা ও পড়ার জন্যে কিভাবে অযু করবে এবং পবিত্র হবে? কারণ অযু এবং পবিত্রতার বিধান তো শুধু মুমিনদের জন্যে, অমুসলিমদের জন্যে নয়?

নাকি অমুসলিমদেরকে কুরআন থেকে দূরে রাখা হবে? এবং তাদেরকে কুরআন ধরতে এবং পড়তে নিষেধ করা হবে?

অথচ মহান আল্লাহ্ আল কুরআন তাদের জন্যেও নাযিল করেছেন, শুধু মুসলিমদের জন্যে নয়।

৫০. দেখা যায়, কেউ মারা গেলে তার কবরের পাশে বসে কুরআন তিলাওয়াত করা হয় বা করানো হয়। এতে কি মৃত ব্যক্তির কোনো ফায়দা হয়?

কবরের পাশে বসে কুরআন তিলাওয়াত করার প্রচলন আল্লাহর রসূলও চালু করেন নাই। সাহাবীগণও একাজ করেন নাই। এ কাজ সুন্নতের খেলাফ।

জীবিতদের কুরআন তিলাওয়াত দ্বারা মৃতদের কোনো ফায়দা হওয়ার সুযোগ নেই। কারণ দুনিয়ার সাথে মৃত ব্যক্তির সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে।

তবে কেউ কোনো ভালো কাজ করে মৃত ব্যক্তির আমল নামায় সেটার নেকী পৌঁছানোর জন্যে যদি আল্লাহর কাছে দোয়া করে, সে রকম দোয়া করা জায়েয আছে বলে আলেমগণ মত দিয়েছেন। কিন্তু তাতে মৃত ব্যক্তির ফায়দা হবে কিনা তা আল্লাহই ভালো জানেন।

৫১. আমাদের দেশে বিভিন্ন উপলক্ষ কেন্দ্রিক কুরআন খতম করার রেওয়াজ চালু আছে। কেউ মারা গেলে কুরআন খতম করা হয়, কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে নিয়্যত করে বা মান্নত করে করে কুরআন খতম করা হয়, শবিনা খতম করা হয়। এগুলোর কি কোনো ভিত্তি আছে?

কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করা, তিলাওয়াত করে শেষ করা, একবার শেষ করে আবার শুরু থেকে তিলাওয়াত করা, বারবার তিলাওয়াত করে শেষ করা অবশ্যি নেক কাজ।

কিন্তু রসূলুল্লাহ সা. কারো মৃত্যুতে কুরআন খতম করেন নাই, করতে বলেন নাই। তিনি উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে কুরআন খতম করেন নাই, করতে বলেন নাই। তিনি শবিনা খতম করেন নাই, করতে বলেন নাই। তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে কুরআন খতম করার কোনো রেওয়াজ চালু করেন নাই। সাহাবীগণও এ ধরনের কাজ করেন নাই।

একজন সাহাবী প্রতি রাত্রে পুরো কুরআন শেষ করেন-একথা শুনে রসূলুল্লাহ সা. তাঁকে ডাকেন এবং এক রাতে কুরআন খতম করতে নিষেধ করে দেন। সুতরাং সুন্নতের খেলাপ পদ্ধতি ত্যাগ করে সুন্নত পদ্ধতিতে কুরআন তিলাওয়াত করা উচিত।

জাহেলী ধ্যান ধারণা

৫২. আমাদের দেশে বিভিন্ন বালা মসিবত দূর করা এবং নিয়্যত পূরণ করার উদ্দেশ্যে দোয়া ইউনুস খতম করা হয়। খতমে তাহলীল করা হয়। লোক ডেকে এনে অথবা বিভিন্নজনকে ভাগ করে দিয়ে এক লক্ষ বার এইসব কলেমা পাঠ করা হয়। এর কি কোনো ভিত্তি আছে?

এই ধরনের খতমের ভিত্তি হলো ধারণা অনুমান। আর অনুমান হলো ছড়ি ছাড়া অন্ধ লোকের পথ চলার মতো।

কুরআন বা সুন্নায় এ ধরনের খতমের কোনো ভিত্তি নেই। এগুলো মনগড়া প্রথা।

ইসলাম ধারণা অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, ইসলাম কুরআন সুন্নাহর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। -এসব কাজ সুন্নতের খেলাফ।

৫৩. সাধারণত লোকেরা মনে করে, মুসলমানরা বেহেশতে যাবে আর হিন্দুরা দোযখে যাবে। -এ ধারণা কি ঠিক? সব মুসলমানই কি বেহেশতে যাবে?

বেহেশতে যাওয়ার ব্যাপারে হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদি, খৃষ্টান, সাদা, কালো, আরব অনারব নেই। কারা বেহেশতে যাবে, আর কারা দোযখে যাবে-তা কুরআন মজিদে বলে দেয়া হয়েছে।

যে কোনো মানব সন্তানই বেহেশতে যেতে পারবেন-যদি তিনি:

১. আল্লাহর প্রতি ঈমান আনেন এবং তাঁর সাথে কাউকেও শরিক না করেন;
২. কুরআন নির্দেশিত অন্যান্য বিষয়ের প্রতি ঈমান আনেন;
৩. মুহাম্মদ সা.-কে আল্লাহর সর্বশেষ নবী ও রসূল মেনে নেন এবং তাঁকে পরিপূর্ণ অনুসরণ করেন;
৪. নামায, যাকাত, রোযা, হজ্জসহ কুরআন সুন্নাহ নির্দেশিত ইসলামের সকল বিধান নিষ্ঠার সাথে পালন করেন;
৫. আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূলের সকল আদেশ নিষেধ পালন করেন। হালালকে হালাল হিসেবে গ্রহণ করেন এবং হারামকে হারাম মেনে নিয়ে তা বর্জন করেন;
৬. ইসলামের ঘরে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করেন এবং
৭. এক আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন আর পরকালীন নাজাত ও সাফল্যকে জীবনের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেন।

এই শর্তগুলো পূর্ণ করলে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, কূল, গোত্র নির্বিশেষে যে কোনো ব্যক্তি বেহেশতে যেতে পারবে।

এই শর্তগুলো মেনে নিয়ে আরবের মুশরিক, ইহুদি, খৃষ্টান এবং অন্যান্য ধর্মের লোকেরা নবীর সাথি হয়েছিলেন এবং তারা বেহেশতে যাবেন।

অন্যদিকে এই শর্তগুলো পূরণ না করলে মুসলমানের সন্তান হলেও, এমনকি নবীর সন্তান হলেও কেউ বেহেশতে যেতে পারবেনা। এ কারণেই-

আমাদের নবীর চাচা আবু তালিব ও আবু লাহাব, ইবরাহিম আ.-এর পিতা আযর, নূহ আ.-এর ছেলে কিনান, নূহ ও লূত-এই নবীগণের দুই স্ত্রী -এরা

নবীদের নিকটজন হয়েও জান্নাতে যেতে পারবেনা। অথচ বড্ড কাফির ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া জান্নাতে যাবেন।

৫৪. সিহাহ সিত্তায় উল্লেখ আছে, তাই সহীহ- এটা কি সঠিক কথা?

এটি সাংঘাতিক একটি ভুল কথা। কারণ,

১. যে ছয়টি গ্রন্থকে সিহাহ সিত্তা বলা হয়, সেগুলোর মধ্যে বুখারি ও মুসলিম ছাড়া বাকি চারজন ইমাম নিজেরাই তাদের গ্রন্থগুলোকে সহীহ হাদিসের গ্রন্থ হিসেবে সংকলন করেন নাই। সে চারটি গ্রন্থ হলো : সুনানে তিরমিযি, সুনানে নাসাঈ, সুনানে আবু দাউদ এবং সুনানে ইবনে মাজাহ।

২. হাদিসের সহীহ সংকলন করার দাবি করেছেন শুধুমাত্র ইমাম বুখারি, ইমাম মুসলিম, ইমাম ইবনে খুজাইমা, ইমাম ইবনে হিব্বান, ইমাম দারা কুতনী, ইমাম হাকিম এবং ইমাম যিয়াউদ্দীন মাকদিসী।

৩. কিন্তু বিশেষজ্ঞ মুহাদ্দিসগণের বিশ্লেষণে বুখারি এবং মুসলিম ছাড়া বাকি সকল গ্রন্থেই সহীহ হাদিসের সাথে সাথে যয়ীফ এবং জাল হাদিসও রয়েছে।

৪. হাদিস বিশারদগণ সকল গ্রন্থ থেকে যয়ীফ এবং জাল হাদিস সমূহ চিহ্নিত করে আলাদা গ্রন্থাবলী সংকলন করেছেন।

৫. অধিকাংশ জয়ীফ ও জাল হাদিস তৈরি করা হয়েছে মর্যাদা ও ফযিলত বর্ণনার ক্ষেত্রে।

৬. অনেক লেখক, ওয়ায়েয এবং অবিবেচক আলেম তাদের বই পুস্তক এবং ওয়ায নসিহতে যয়ীফ ও জাল হাদিস উল্লেখ করেন। এতে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হয়।

৫৫. কিছু সুফি সাধক ইল্‌মকে দুইভাগে ভাগ করেন, যাহেরি ইল্‌ম ও বাতেনি ইল্‌ম। তারা বলেন, বাতেনি ইল্‌ম কুরআন হাদিসের ইল্‌ম থেকে পৃথক। কঠোর সাধনার মাধ্যমেই কেবল এই ইল্‌ম লাভ করা যায়। এটাকে তারা রূহানি ইল্‌মও বলে থাকেন। আবার কেউ কেউ এটাকে ইল্‌মে লাদুন্নিও বলেন। -ইল্‌মের এই বিভাগ এবং বাতেনি ইল্‌মের সত্যতা সম্পর্কে জানতে চাই।

কুরআন হাদিসে ইল্‌মকে যাহেরি ও বাতেনি নামে কোনো প্রকার ভাগ করা হয়নি। রূহানি ইল্‌ম এবং ইলমে লাদুন্নির অস্তিত্বও কুরআন হাদিসে নেই।

মনে রাখবেন, কুরআন সুন্নাহ পরিপূর্ণ ও নিখুঁত (perfect) জ্ঞানভান্ডার। এর বাইরে ইসলামি জ্ঞানের কোনো অস্তিত্ব নেই। বাকি সবকিছুর মানদন্ড (criterion) কুরআন সুন্নাহ :

- اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

অর্থ: আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ (perfect) করে দিলাম, তোমাদের প্রতি সম্পূর্ণ (complete) করে দিলাম আমার অনুগ্রহ (অহি) এবং তোমাদের দীন মনোনীত করলাম ইসলামকে। (সূরা ৫ মায়িদা : আয়াত ৩)

ইসলামকে জানা বুঝা, মানা অনুসরণ করা এবং আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও উন্নত করার জন্যে এর বাইরে আর কোনো ইল্মের অস্তিত্ব নেই। আল্লাহ পাক সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন:

اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ●

অর্থ: তোমাদের রব-এর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে যা নাযিল করা হয়েছে, তোমরা কেবল তারই অনুসরণ করো এবং তাঁকে ছাড়া অন্য অলিদের অনুসরণ করোনা। তবে, তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ করো। (সূরা ৭ আ'রাফ: আয়াত ৩)

إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ●

অর্থ: এসব লোক শুধু ধারণা অনুমানেরই অনুসরণ করে। সত্য জ্ঞানের বর্তমানে ধারণা অনুমানের কোনো মূল্যই নেই। (সূরা ৫৩ আন নজম : আয়াত ২৮। আরো দ্রষ্টব্য : ৩:৭, ৬:১১৬, ১০:৬৬, ৫৩:২৩)

সুতরাং কুরআন সুন্নাহ্র বাইরে যদি কোনো ইসলামি জ্ঞান বা জ্ঞানোৎসের দাবি করা হয়, তবে তা অবশ্যি মনগড়া অথবা শয়তানের প্ররোচনা।

৫৬. মক্তবে ১৩০ ফরয পড়ানো হয়। ১৩০ ফরযের সূত্র কি? তাতে চার মাযহাবকেও চার ফরয বলা হয়।

১৩০ ফরযের কোনো ভিত্তি নেই। মাযহাব মানা ফরয তো নয়ই। এমনকি সুন্নতও নয়।

এটি একটি ভুল শিক্ষা মুসলিম সমাজে প্রবেশ করেছে।

৫৭. আজকাল ব্যাপকভাবে জন্ম বার্ষিকী ও মৃত্যু বার্ষিকী পালন করার তোড়জোড় দেখা যায়। নিজের, সন্তানের, পীর বুযুর্গের, পিতা মাতার ও নেতাদের মৃত্যু বার্ষিকী পালন করা হয়। -এটা বৈধ কি?

জন্ম মৃত্যু বার্ষিকী পালন করা ইসলামি রেওয়াজ নয়। আল্লাহ্র রসূল এটা করেননি। সাহাবীগণ রসূলের এবং তাদের নিজেদের জন্ম মৃত্যু বার্ষিকী পালন করেননি। এসব উপলক্ষে তাঁরা কোনো প্রকার অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করেননি।

সুতরাং জন্ম মৃত্যু বার্ষিকী পালন করা একটা বিদ'আত, এমনকি সে অনুষ্ঠানে যদি কুরআন তিলাওয়াত, ধর্মীয় আলোচনা এবং দোয়ার আয়োজনও করা হয়।

তবে মৃত ব্যক্তিদের উত্তম গুণাবলী সব সময়ই আলোচনা হতে পারে এবং তাদের জন্যে সব সময়ই দোয়া করা যেতে পারে। বিদআত শুধু জন্ম মৃত্যুর তারিখে বা উপলক্ষে অনুষ্ঠান করা বা বার্ষিকী পালন করা।

৫৮. গ্রামে গঞ্জে দেখা যায় নৈতিক অপরাধের জন্যে ফতোয়া দিয়ে কিংবা সালিশি করে ছেলে বা মেয়েদেরকে, বিশেষ করে মেয়েদেরকে দোররা মারা হয়। এটা কি বৈধ?

যিনা-ব্যভিচার বা অনৈতিক ও অশ্লীল কাজের জন্যে গ্রামে গঞ্জে বিচ্ছিন্ন ফতোয়া দিয়ে বা সালিশি করে দন্ড প্রয়োগ করার অনুমতি ইসলামে নেই।

ইসলামি নিয়মানুযায়ী যে কোনো দন্ডযোগ্য অপরাধের জন্যে অপরাধীকে শাস্তি প্রদানের দায়িত্ব হলো সরকারের।

এর নিয়ম হলো, যে কোনো অপরাধের জন্যে-

১. সরকারি বা সরকার অনুমোদিত আদালতে অভিযোগ (মকদ্দমা) দায়ের করতে হবে।
২. ঘটনা প্রত্যক্ষকারী নির্ধারিত সংখ্যক সাক্ষী থাকতে হবে।
৩. প্রশাসনের সহযোগিতায় আদালত কর্তৃক ঘটনা তদন্ত করতে হবে।
৪. অতপর সাক্ষ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে বিধি অনুযায়ী আদালত কর্তৃক অভিযুক্তের শাস্তি হবে।
৫. উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণ না পাওয়া গেলে অভিযুক্ত অভিযোগ থেকে রেহাই পাবে।

এ নিয়মের বরখেলাফ করে অন্য কোনো ভাবে দন্ড প্রয়োগ করার অনুমতি ইসলামে নেই।

তবে পিতা মাতা, অভিভাবক এবং শিক্ষক কর্তৃক সন্তান, অধীনস্ত এবং ছাত্রদেরকে শিক্ষা প্রদান ও সতর্ক করার জন্যে কোনো লঘু শাস্তি প্রদান (তাযীর) করা হলে তা বৈধ।

৫৯. আমাদের দেশে বিশাল আয়োজনের সাথে শবে বরাত পালন করা হয়, এতে অনুষ্ঠানাদি করা হয়, ছেলে মেয়েদের মধ্যে বিরাট তোড়জোড় দেখা যায়, ঐ রাত্রে কবরস্থানে যাওয়া হয়। বিশেষ ধরণের নামায পড়া হয়, রুটি বিলানো হয়। -এগুলোর কি কোনো ভিত্তি আছে?

শবে বরাত নামে কোনো অনুষ্ঠান বা ইবাদত অনুষ্ঠান ইসলামে নেই।

কয়েকটি হাদিসে শাবান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাত্রের কিছু ফযিলত বর্ণনা করা হয়েছে। এই হাদিস ক'টি সবই জয়ীফ।

রসূল সা. এই রাত্রের জন্যে কোনো বিশেষ ইবাদত বা নামায নির্ধারণ করেননি। এই নির্দিষ্ট দিনই গরিবদেরকে রুটি বিলাতে হবে, এমনটিও তিনি নির্ধারণ করেননি।

সুতরাং ঐ রাত্রের জন্যে বিশেষভাবে নির্ধারিণ করে কোনো বিশেষ ইবাদত, নামায, দান সদকা, অনুষ্ঠানাদি ইত্যাদি করা বিদ'আত।

৬০. আমাদের সমাজে ব্যাপকভাবে মিলাদের প্রচলন আছে। জীবনে, মরণে, বিপদে মুসিবতে, আয়োজনে, উদ্বোধনে মিলাদ পড়ানো হয়। মিলাদ পড়া বা মিলাদ মাহফিল করা কি জায়েয?

আমাদের সমাজে যে মিলাদ প্রচলিত আছে, রসূল সা. এ মিলাদের প্রচলন করেননি। সাহাবায়ে কিরামও করেননি, তাবেয়ীগণও করেননি। অতীতের ইমাম মুজতাহিদরাও করেননি।

জানা যায়, কোনো এক ফাসিক বাদশাহ কর্তৃক মিলাদের প্রচলন শুরু হয়।

এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট কথা হলো, এমন কোনো কাজই ইসলামের ধর্মীয় কাজ নয়, যা আল্লাহর রসূল সা. চালু করেন নাই এবং সাহাবীগণও চালু করেন নাই।

এ ধরণের কোনো কাজকে ইসলামের ধর্মীয় কাজ মনে করে, ইবাদতের কাজ মনে করে, সওয়াবের কাজ মনে করে, নেকীর কাজ মনে করে পালন করা সুস্পষ্ট বিদ'আত।

৬১. অনেকে বিভিন্ন কথা লিখে এবং কুরআনের আয়াত লিখেও গলায় তাবিজ তুমার ঝুলায়, কোমরে বাধে, ঘরে ঝুলিয়ে রাখে। এগুলো কি বৈধ? এতে কি রোগ সারে?

এগুলোতে রোগ সারে কিনা চিকিৎসকরা বলতে পারবেন। তবে আল্লাহর রসূল একাজ করেননি। সাহাবীগণও করেননি।

বরং রসূল সা. কারো গলায় তাবিজ তুমার দেখলে রাগান্বিত হতেন। তিনি তাবিজ তুমার নিতে নিষেধ করে দিয়েছেন। দৃষ্টিভংগি অনুযায়ী কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাবিজ তুমার মানুষকে শিরকে নিমজ্জিত করে।

তবে কুরআন পড়ে ফু দেয়ার অনুমতি আছে। একবার একদল সাহাবী একাজ করলে রসূল সা. অনুমোদন দিয়েছিলেন।

৬২. যদিও পীরদের মাধ্যমে বহু শতাব্দী ধরে আমাদের দেশে দীনের আলো নিভু নিভু হলেও জ্বলে আসছে; কিন্তু একথা সুস্পষ্ট যে আমাদের সমাজে যতো শিরক ও বিদআত প্রচলিত হয়েছে তার অধিকাংশই পীর মুরিদীর মাধ্যমে প্রচলিত হয়েছে। পীর মুরিদী সম্পর্কে বলা হয় হয়- পীর ধরা এবং মুরিদ হওয়া ফরয। আসলে পীর মুরিদী কি ইসলামে বৈধ?

পীর মুরিদীর সিলসিলা আল্লাহ্‌র রসূল চালু করেন নাই, সাহাবীগণও চালু করেন নাই। ইসলামের ইতিহাসে কোনো বড় আলেম উলামা পীরগীরি করেন নাই।

জাহিল এবং অর্ধ আলেম লোকেরাই নিজেদের পীর দাবি করে, পীরের দিকে লোকদের আহবান করে এবং মুরিদ হয় ও মুরিদ বানায়।

তারা পীর ধরা ফরয বলে প্রচার করে। তারা কুরআন মজিদের 'ওয়াবতাগু ইলাইহিল অসিলা'- এই আয়াতাংশকে পীর ধরার প্রমাণ হিসেবে পেশ করে। অথচ এই আয়াতাংশের সাথে পীর ধরার কোনো প্রকার সম্পর্ক নেই। ইসলামের কোনো বিজ্ঞ আলেম এ আয়াতের এ রকম ব্যাখ্যা করেননি।

বর্তমানে মুসলিম সমাজে পীর মুরিদীর যে সিলসিলা চালু আছে তা সুস্পষ্টভাবে বিদ'আত।

একথাও সত্য, পীর মুরিদীর নামে সমাজে শিরক এবং বিদআত চালু করা হচ্ছে এবং ধরে রাখা হচ্ছে।

মুসলিম সমাজকে শিরক ও বিদআত পরিহার করে কুরআন সুন্নাহ্‌র দিকে ফিরে আসতে হবে। তাদেরকে কুরআন বুঝতে হবে এবং কুরআন সুন্নাহ্‌র অনুসরণ করে চলতে হবে। রসূল সা. বলেছেন:

"আমি তোমাদের মধ্যে দুটো জিনিস রেখে যাচ্ছি, এদুটোকে আঁকড়ে ধরলে তোমরা কখনো বিপথগামী হবেনা। তার একটি আল্লাহ্‌র কিতাব (আল কুরআন) আর অপরটি তাঁর রসূলের সুন্নাহ।" (সূত্র : মুসনাদে আহমদ। বিদায় হজ্জের ভাষণের অংশ)

অনেক ভালো পীরের মাধ্যমে ইসলামের বেশ খেদমত হয়েছে। সাধারণ মানুষকে তারা নামায রোযা করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। কিন্তু পরবর্তীতে পীর মুরিদী একটা ব্যবসা বাণিজ্যে পরিণত হয়েছে।

৬৩. কোনো ব্যক্তি পীর নামে খ্যাতি অর্জন করলে তার ছেলে শাহ্ কিংবা সাহেবজাদা উপাধি ধারণ করে এবং তার মৃত্যুর পর তার ছেলে বা বড় ছেলে গদ্দিনশীন পীর হয়ে বসে। -এভাবে গদ্দীনশীন হওয়া কি জায়েয?

পীরগিরি যদি কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, কিংবা জমিদারি হয়ে থাকে, তবে পীরের ছেলের গদ্দিনশীন হবার একটা কারণ থাকে। কিন্তু ইসলাম এবং ইসলাম প্রচারের নামে ছেলে পিতার গদ্দিনশীন হবার বিধান ইসলামে নেই।

এটা সুস্পষ্ট বিদআত। এ পন্থার সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই।

৬৪. পীরের হাতে বায়াত করা কি জরুরি?

কুরআনে উল্লেখ আছে (সূরা আল ফাত্‌হ) রসূল সা. হুদাইবিয়ার সন্ধির প্রাক্কালে সাহাবীগণ থেকে বায়াত (নিজের জীবনকে আল্লাহর কাছে বিক্রি করে দেয়ার প্রতিজ্ঞা) গ্রহণ করেছিলেন আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করা এবং জীবন উৎসর্গ করার

জন্যে। এছাড়া সাহাবীগণ খোলাফায়ে রাশেদীনের কাছে তাদের নির্দেশ পালন করার বায়াত করেছিলেন। পীরের হাতে বায়াত করার কোনো ভিত্তি নেই। আর পীর মুরিদীই তো বিদআত।

৬৫. কিছু লোক বুযুর্গ ব্যক্তিদের কবরকে 'রওজা' বলে। এমনকি 'রওজা শরিফ' 'রওজা পাক' এবং 'রওজা মোবারক' বলে থাকে। তারা রসূলুল্লাহ সা.-এর কবরকেও 'রওজা' বা 'রওজা মোবারক' 'রওজা পাক' 'রওজা শরিফ' বলে থাকে। -এ ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভংগি কি?

রওজা আরবি শব্দ। এর অর্থ- বাগান বা উদ্যান। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: "আমার ঘর এবং আমার মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানটি রওজাতুম মিন রিয়াজিল জান্নাত- জান্নাতের রওজাসমূহের একটি রওজা।"

কুরআন বা হাদিসে কোথাও কবরকে রওজা বলা হয় নাই। সাহাবীগণও বলেন নাই, তাবেয়ীগণও বলেন নাই।

সুতরাং যারা পুণ্যবান ব্যক্তিগণের কবরকে 'রওজা পাক', 'রওজা মোবারক' বা 'রওজা শরিফ' বলে, তা কবরের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশের জন্যেই বলে। এই ভক্তি শ্রদ্ধার বিষয়টি তাদের আকিদা বিশ্বাসে পরিণত হয়ে যায়। ফলে এটা শিরক পর্যন্ত পৌছুতে পারে।

কবরকে অন্য কিছু বলা উচিত নয়। কবরকে কবর বলাই ইসলামি পরিভাষা। কবরকে দরগাহ, মাযার, রওজা বলা পরিত্যাগ করুন। 'শরিফ' তো নয়ই।

৬৬. অনেকে মনে করে, নবীকে স্বপ্নে দেখা বুযুর্গীর লক্ষণ। একথা কি ঠিক?

নবীকে স্বপ্নে দেখা যদি বুযুর্গীর লক্ষণ হয়, তবে যে আবু লাহাব আবু জাহলরা তাঁকে বাস্তবে দেখেছে, তারা কতো বড় বুযুর্গ!

কেউ যদি সত্যিই রসূল সা. কে স্বপ্নে দেখে, তবে তার উচিত আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা। এতে আত্মতৃপ্তির কিছু নেই।

ব্যাপার এমনো হয় যে, অনেক লোককে শয়তান এসে বলে: আমি আল্লাহর রসূল, তোমাকে এই এই অসিয়ত করছি।

এই ভাবে শয়তান জাহিল লোকদের বিভ্রান্ত করে।

আল্লাহর রসূলকে বাস্তবে না দেখার কারণে স্বপ্ন দ্রষ্টার কাছে যে এসেছে, সে কি শয়তান, নাকি আল্লাহর রসূল তা নির্ণয় করা অনেকের পক্ষেই সম্ভব নয়।

৬৭. পিতা, মাতা বা আত্মীয় স্বজন মারা গেলে জীবিত ছেলে মেয়েরা বা আত্মীয় স্বজন তাদের জন্যে আলেম উলামা ডেকে দোয়া করান। কুলখানি,

ফাতেহা খানি ইত্যাদি করান। চারিদনা, চল্লিশা ইত্যাদি করান। এগুলো কি জায়েয? এগুলো দ্বারা মৃত ব্যক্তিরা কি সওয়াব লাভ করেন?

আল্লাহর রসূল এগুলো চালু করেন নাই। সাহাবীগণও এসব কাজ করেননি। এসব অনুষ্ঠান সুন্নতের খেলাফ।

চারদিনা, চল্লিশা, কুলখানির অনুষ্ঠান, ফাতেহাখানির অনুষ্ঠান ইত্যাদি তো মুসলমানদের গলায় কাঁটার মালা।

এগুলো লোকেরা উদ্ভাবন করেছে এবং ধর্মের লেবাছ পরিয়ে মুসলিম সমাজে চালু করেছে।

এ ব্যপারে কুরআন হাদিসের সুস্পষ্ট বক্তব্য হলো: মানুষের মৃত্যু হলে দুনিয়ার সাথে তার সকল আমল ছিন্ন হয়ে যায়। তবে তিনটি নেক আমলের সওয়াব তার আমলনামায় যুক্ত হতে থাকে। সেগুলো হলো:

১. তিনি যদি নেককার দীনদার সন্তান রেখে যান এবং তারা যদি তার জন্যে দোয়া করে, তবে তিনি সে দোয়ার ফল পাবেন।

২. তিনি যদি দীনের জ্ঞান শিক্ষা দিয়ে বা প্রচার প্রসার করে গিয়ে থাকেন, তা ব্যক্তি ও প্রজন্ম পরম্পরায় যতোদিন হস্তান্তর, চর্চা ও আমল হতে থাকবে, তিনি তা থেকে সওয়াব হাসিল করতে থাকবেন।

৩. তিনি যদি জনকল্যাণে কোনো স্থায়ী কাজ করে গিয়ে থাকেন, তবে জনগণ যতোদিন তা থেকে উপকৃত হতে থাকবে, তিনি ততোদিন তা থেকে সওয়াব হাসিল করবেন।

৬৮. শিয়ারা কি মুসলমান?

শিয়া হল ইহুদী আব্দুল্লাহ ইবনু সাবার আকিদার অনুসারী একটি বিদয়াতগ্রস্ত ভ্রান্ত দল। আব্দুল্লাহ ইবনু সাবা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আল্লাহ বলে উক্তি করত। তাদের অনেকের আকিদা হল আলী হলেন আল্লাহ আর তিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন, আমরা তাদের এসব শিরক থেকে আল্লাহর উর্ধ মর্যাদা ও পবিত্রতা ঘোষণা করছি। এরাই আবু বকর, উমর, উসমান রাদিউয়াল্লাহু আনহুমকে গালি গালাজ করে। তাদের কেউবা আবু বকর, উমরকে কাফের-মুরতাদ বলে। কেননা তাদের কথায় এ দু'জনের কারণে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রথমে খলিফা হতে পারেননি। ইহুদী ইবনু সাবা এভাবেই মুসলিমদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য নবীর বংশধর বলে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে উর্ধে তুলে আল্লাহর মর্যাদায় আসীন করল। এদের একদলকে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর খিলাফতকালে পুড়িয়ে হত্যা করেছিলেন। ইবনু সাবা অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছিল। অতঃপর সে রোমে চলে যায়। আমরা আলী, হাসান, হোসাইন, ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা ও আনহুম সহ নবীজীর সকল বংশধরকে ভালোবাসি।

তাঁরা আমাদের প্রাণের টুকরা এতে কোন সন্দেহ নেই।তাদেরকে যারা ভালোবাসবে একই কারণে তারা আবু বকর, উমর, উসমান সহ সকল সাহাবীকে সমানভাবে ভালোবাসবে, তাঁদের কারো প্রতিই বিদ্বেষ পোষণ করবে না। অতি ভালোবাসা কোন ভালোবাসাই নয়। বরং এটা ভালোবাসার পাত্রকে নিন্দিত করার নামান্তর। বাংলাদেশে এক সময় কারবালা দিবসের হায় হোসাইন, হায় হোসাইন চিৎকার, তাজিয়া, ইয়া আলী হুংকার, সুফীবাদ, পীরবাদের ছড়াছড়ি, গাউস-কুতুব, খাজা বাবা, কবর পূজা, নবী, ওলী আউলিয়াদের প্রতি আল্লাহর মত করে ভক্তি শ্রদ্ধা এসব বিভ্রান্তি এসেছে অনেকটাই ফারসি ভাষা ও শিয়া সংস্কৃতির মাধ্যমে।

অতএব, মোট কথা শিয়ারা একটি বাতিল ফিরকা ও বিদয়াতগ্রস্ত বিভ্রান্ত দল। এরা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াহ এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

৬৯. যাহেরি ইল্ম ও বাতেনি ইলম -এই দুই প্রকার ইল্ম আছে বলে প্রচার করা হয়। প্রকৃত ব্যাপার কি?

কুরআন হাদিসে ইল্মের এধরণের কোনো ভাগ নেই। তাছাড়া বাতেনি (গোপন) ইল্ম বলে কোনো ইল্ম ইসলামে নেই। ইসলামের সকল ইল্মই প্রকাশ্য এবং সুস্পষ্ট।

কুরআন হাদিসের বাইরে ইসলামের কোনো ইল্ম নেই।

গোপন (বাতেনি) ইল্ম নামে কোনো ইল্ম থাকার দাবি করা হলে তা অবশ্যি শয়তানি ইল্ম এবং শয়তানের অসওয়াসা।

৭০. শরিয়ত, তরিকত এবং মারেফাত নামে বিভিন্ন ইল্ম ও তরিকা থাকার দাবি করা হয়। আসলে এগুলো কী?

এক ধরণের অজ্ঞ পীর সুফি ব্যক্তিরা ইসলামকে শরিয়ত, তরিকত এবং মারেফাত নামে বিভিন্নভাগে ভাগ করে নিয়েছে।

তারা শরিয়তকে যাহেরি (প্রকাশ্য) ইল্ম এবং তরিকত ও মারেফাতকে বাতেনি (গোপন) ইল্ম হিসেবে প্রচার করে।

তরিকত ও মারেফাত নামে যে জিনিসের প্রচার করা হয়, তার সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই।

৭১. ইল্মে তাসাউফ কি? এটা কি কোনো জরুরি ইলম?

তাসাউফ মানে সুফীদের শাস্ত্র। কয়েক শতাব্দী পূর্বে সুফী দরবেশরা দুনিয়াদারি ত্যাগ করে নির্জনতা অবলম্বন করার পদ্ধতি অবলম্বন করেন। এটাকে তারা আত্মশুদ্ধির পন্থা হিসেবেই গ্রহণ করেন।

তাসাউফ শাস্ত্র এসেছে মূলত প্রাচীন গ্রীক দর্শন এবং ভারতীয় বেদান্ত দর্শন থেকে। নির্জন আধ্যাত্মিক সাধনা দর্শন হিসেবে এ শাস্ত্র গড়ে উঠে।

প্রথম প্রথম ভালো নিয়তেই কিছু লোক এ পদ্ধতি অবলম্বন করেন।

তবে এ পদ্ধতিটি সুস্পষ্ট বিদআত। পরবর্তীতে এর মধ্যে ঢুকে পড়েছে শিরক। মূলত রসূল সা. প্রদর্শিত পদ্ধতি ছাড়া ইসলামে আর কোনো পদ্ধতি নেই। আল্লাহ পাক বলেন: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

অর্থ: তোমাদের জন্যে আল্লাহর রসূলের মধ্যেই রয়েছে উত্তম আদর্শ। (সূরা ৩৩ আহযাব: আয়াত ২১)

৭২. কিছু লোক প্রচার করে ইলামে রাজনীতি নেই- একথা কি ঠিক?

রাজনীতি মানে- রাজারনীতি, অথবা শ্রেষ্ঠনীতি, কিংবা রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি।

গোটা কুরআন হাদিস রাজনৈতিক আলোচনা এবং দিক নির্দেশনায় ভরপুর।

ইসলামে রাজনীতি আছে কথা শুধু এতোটুকুই নয়, বরং নবীগণই রাজনীতি চালু করেছেন। মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা. ছিলেন রাজনীতির সর্বোত্তম মডেল।

কুরআন রাজনীতির গাইডবুক।

যারা বলে ইসলামে রাজনীতি নাই, -তারা হয় ইসলাম সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ জাহিল, নতুবা ধর্মহীন সম্প্রদায়, অথবা ধর্মের নামে প্রতারক।

যারা প্রতারিত হচ্ছেন, তারা অন্তত একবার কুরআন পড়ে দেখুন এবং আল্লাহ্র রসূলের একটি বিশুদ্ধ জীবনী পড়ে দেখুন।

৭৩. অনেকেই নামায পড়ার সময় প্যান্ট- পায়জামা নিচের থেকে গুটিয়ে নেয়। এটা খুবই অসুন্দর দেখায়। এমনটি করা কি ঠিক?

এটা খুবই বেমানান কাজ। এটা আল্লাহ্র সাথে একটা বেআদবিও বটে।

রসূল সা. পোশাক টাখনুর নিচে ঝুলাতে নিষেধ করেছেন। যারা আল্লাহ্র রসূলের নিষেধ সত্ত্বেও টাখনুর নিচে প্যান্ট পায়জামা ঝুলায়, তারাই নামাযে তা গুটিয়ে উপরে উঠায়।

ব্যাপারটা যেনো এরকম : আল্লাহ্র রসূল একটা অন্যায় আদেশ দিয়েছেন তাই এ আদেশ মানা যায়না!

- সমাজের লোকেরা খারাপ মনে করে তাই প্যান্ট পায়জামা লম্বা করে বানানো এবং পরা হয়। বিষয়টা আল্লাহ টের পাননা!

- কিন্তু মসজিদে গেলে আল্লাহ দেখতে পান, তাই গুটানো হয়!

নাউযুবিল্লাহ! যাদের টাকনুর নিচে পোশাক পরার ব্যারাম আছে, তাদের ভাবটা ঐ রকমই। সকলের জানা থাকা প্রয়োজন, টাখনুর নিচে পোশাক পরার নিষেধাজ্ঞা শুধু মসজিদের জন্যে নয়, বরং সমাজে চলা ফেরার ক্ষেত্রেই অধিক প্রযোজ্য।

নিম্নোক্ত বিষয়গুলোও ধ্যানধারণাগত ভ্রান্তি :

৭৪. ঈদে মিলাদুন্নবী পালন করা বিদ'আত।

৭৫. মহরমের তাজিয়া মর্সিয়া সম্পূর্ণ বিদ'আত।

৭৬. নিজের পিতা ছাড়া অন্য কাউকেও পিতা বলা ফাসেকি।

৭৭. মুখ ডাকা কন্যাকে বিয়ে করা যায় না- একথা মনে করা ফাসেকি।

৭৮. যাদু টোনা বা বানটোনা করা কুফুরি।

৭৯. মেয়েদের মসজিদে যেতে নিষেধ করা সুন্নতের খেলাফ।

৮০. আল্লাহ ছাড়া অপর কারো নামে শপথ করা শিরকতুল্য।

৮১. কোনো বিশেষ লেবাস বা পোশাককে সুন্নতি লেবাস বা পোশাক বলা বিদআত। কারণ রসূল সা. কোনো সুন্নতি লেবাস চালু করে যাননি।

৮২. আল্লাহ আল্লাহ বা ইল্লাল্লাহ ইল্লাল্লাহ বলে যিকর করা সুন্নতের খেলাফ।

৮৩. দল বেঁধে, নেচে নেচে কিংবা সরবে যিকির করা সুন্নতের খেলাপ।

৮৪. রসূল সা. এর আদতকে (অভ্যাসকে) সুন্নত মনে করা বিদআত।

৮৫. অর্থহীন, ভুল অর্থ, কিংবা কদর্থের নাম রাখা সুন্নতের খেলাফ। সুন্দর অর্থের আরবি নাম রাখা উচিত।

৮৬. নিজে তাওবা না করে অপরের নিকট তাওবা পড়া বিদ'আত।

৮৭. রক্ত সম্পর্ক ছিন্ন করা কুফরি।

বিয়ে শাদী ও দাম্পত্য জীবনে ভ্রান্তি

৮৮. বিয়েতে গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান করা হয়। বরের বাড়িতে বরকে এবং কনের বাড়িতে কনেকে গায়ে হলুদ দেয়া হয়। এ অনুষ্ঠানে ছেলে মেয়েরা একত্রে জড়ো হয় এবং আনন্দ উৎসব করে। -এটা কি বৈধ?

গায়ে হলুদ অন্য কোনো ধর্মের ধর্মীয় অনুষ্ঠান না হলে, শুধু বিয়ের আনন্দ উৎসব হিসেবে তা নাজায়েয হবার কোনো কারণ নেই।

এ ক্ষেত্রে ইসলামের দৃষ্টিতে অকাট্য নিষিদ্ধ হলো, কণের গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানে ছেলেদের প্রবেশ করা বা অংশগ্রহণ করা এবং বরের গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানে মেয়েদের প্রবেশ করা বা অংশ গ্রহণ করা।

৮৯. অনেক বিয়েতে বিশাল অংকের মোহরানা ধার্য করা হয়, যা পরিশোধ করা হয়না। অনেক সময় তা পরিশোধ করা ছেলের সাধ্যাতীত থাকে। ধার্যের সময় বলা হয়ঃ মোহরানা দেয়ইবা কে, নেয়ই বা কে? তবে বংশ মর্যাদা অনুযায়ী বড় অংকের মোহরানা ধার্য করতে হবে। -এটা কি বৈধ?

মোহরানা বিয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। মোহরানা পরিশোধ না করার নিয়্যতে বিয়ে করলে বিয়ে বৈধ হবেনা। সুতরাং ছেলের জন্যে যা পরিশোধ করা সম্ভব নয়, সেকরম মোহরানা ধার্য বৈধ নয়।

তবে সামর্থ ও উভয় পক্ষের মর্যাদা অনুযায়ী মোহরানা বেশি পরিমাণ ধার্য করাতে কোনো দোষ নেই।

কিন্তু মোহরানা অবশ্যি পরিশোধ করতে হবে। কনের সম্মতি সাপেক্ষে মোহরানার কিছু অংশ বাকীতে পরিশোধ করাও বৈধ।

৯০. বিয়েতে উপহার বা যৌতুক হিসেবে ছেলের পক্ষ থেকে গয়না অলংকার, শাড়ি ঘড়ি প্রদান করলে সেগুলোর দাম ধরে মোহরানা বাবদ উসুল লেখা হয়। -এতে কি মোহরানা আদায় হবে?

যৌতুক বা উপহার সামগ্রী দ্বারা মোহরানা আদায় হবেনা। মোহরানা বিয়ে সম্পন্ন হবার অবধারিত শর্তসমূহের একটি। সুতরাং এটি বিয়ের একটি ফরয।

অপরদিকে উপহার বা যৌতুক হচ্ছে ঐচ্ছিক সামগ্রী। শরিয়তে বা আইনে যৌতুক এবং উপহার আদান প্রদানের কোনো প্রকার বাধ্যবাধকতা নেই।

তবে কনে যদি মোহরানা হিসেবে অলংকার বা শাড়ী দাবি করে, সেক্ষেত্রে তার দাবিকৃত পরিমাণের অলংকার বা শাড়ি দ্বারা তার মোহরানা উসুল হবে।

কিন্তু কোনো অবস্থাতেই উপহার সামগ্রিকে মোহরানা হিসেবে উসুল দেখানো যাবেনা।

কনে যদি মোহরানার বিনিময়ে সেগুলো গ্রহণ করে সেটা ভিন্ন কথা। সেক্ষেত্রে বলে দিতে হবে, বর পক্ষ উপহার প্রদান করে নাই।

মোহরানা সম্পর্কে জানার জন্যে দেখুন সূরা আন নিসা, আয়াত ২৪।

৯১. অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, বিয়ের আগেই ছেলে ও মেয়ের সাথে সম্পর্ক গড়ে উঠে। তারা একত্রে চলা ফেরা করে। অতপর একসময় বিয়ে করে। -এটা কি বৈধ?

এটা সম্পূর্ণ অবৈধ এবং হারাম। কোনো মেয়ের সাথে বিয়ের পূর্বে অবাধে মেলা মেশা করা, একত্রে ভ্রমণ করা, নির্জনে চলাফেরা করা ইসলামে অকাট্যভাবে নিষিদ্ধ।

ইসলামে শুধু বিয়ের জন্যে প্রস্তাবিত মেয়েকে দূরে থেকে কিংবা কাছে থেকে প্রচলিত উত্তম পন্থায় দেখে নিতে বলেছে এবং শুধু এটাকেই বৈধ করেছে।

এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য : সূরা আন নূর, আয়াত ৩০-৩১।

৯২. অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় আনুষ্ঠানিকভাবে কনে দেখার জন্যে বর, বরের ভাইয়েরা, দুলা ভাইয়েরা, বন্ধু বান্ধব এবং অন্যান্য পুরুষ ও মহিলা আত্মীয় স্বজন এসে সবাই মিলে কনে দেখে। -এটা কি বৈধ?

এটাও ইসলামে নিষিদ্ধ। পর্দা বা হিজাবের নিয়ম ও সীমা লংঘণ করে বর ছাড়া অন্য কোনো পুরুষের পক্ষে কনে দেখা বৈধ নয়। তবে-

১. বর নিয়ম মাফিক দেখতে পারবে,
২. তার মহিলা আত্মীয় স্বজন দেখতে পারবে।
এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য : সূরা আন নূর, আয়াত ৩০-৩১।

৯৩. তালাক দেয়ার ক্ষেত্রে সাধারণত তিন তালাক দেয়া। অনেক সময় রাগের মাথায় এক সাথে তিন তালাক দেয়া দেয়া হয়। -এ ক্ষেত্রে শরিয়তের বিধান কী?

তিন তালাক দেয়া এবং একত্রে তিন তালাক দেয়া দুটোই সুন্নতের খেলাফ।

মূলত চিন্তাভাবনা ছাড়া রাগের মাথায় স্ত্রী তালাক দেয়া নিষেধ। একত্রে বসবাস করার সব রকম চেষ্টার পরও যদি তা সম্ভব না হয় এবং তালাক যদি দিতেই হয়, তবে সুন্নত নিয়ম হলো:

১. তালাক দিবে মোট দুইটি (দ্রষ্টব্য সূরা বাকারা : আয়াত ২২৯)।
২. স্ত্রীর পবিত্রাবস্থার সূচনায় প্রথম তালাক দিয়ে ইদ্দতকাল গণনা করতে থাকবে।
৩. পরবর্তী পবিত্রাবস্থা পর্যন্ত ভাবতে থাকবে স্ত্রীকে রাখবে নাকি বিচ্ছেদ ঘটাবে। রাখলে একত্রে বসবাস শুরু করবে।
৪. বিচ্ছেদ ঘটাতে চাইলে এসময় আরেকটি তালাক দেবে। এতেই বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে যাবে।
৫. কিন্তু ইদ্দতকাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাকে বের করে দেয়া যাবেনা।

৬. ইদ্দতকাল শেষ হবার পর তালাকপ্রাপ্তা তার তালাক দাতা স্বামীর ঘর থেকে বিদায় নেবে।
৭. এই দুইজন পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চাইলে যে কোনো সময় তা করতে পারবে। স্ত্রীর মধ্যবর্তী কোনো বিয়ের প্রয়োজন নেই।

কিন্তু কেউ যদি তার স্ত্রীকে তিনবার তালাক দেন, তবে তিনি আর তার এই স্ত্রীকে বিয়ে করতে পারবেন না।

একত্রে এবং রাগের মাথায় তিন তালাক দিলেও তালাক হয়ে যাবে, যেমন রাগের মাথায় গুলি করলেও মানুষ মারা যায়। অবশ্য এ ক্ষেত্রে কেউ কেউ দ্বিমত পোষণ করেছেন।

৯৪. হিল্লা বিয়ে কি? এটা কি বৈধ?

আমাদের সমাজে প্রচলিত হিল্লা বিয়ে পুরোপুরি না জায়েয এবং হারাম।

কুরআনের বিধান অনুযায়ী স্ত্রীকে তিন তালাক দিলে চিরতরে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। এই স্ত্রীকে সে আর পুনরায় বিয়ে করতে পারবেনা কয়েকটি শর্ত পূর্ণ না হলে। শর্তগুলো হলো :

১. এই তালাকপ্রাপ্তার অন্য কোথাও বিয়ে হতে হবে,
২. সেই স্বামী মারা যাওয়ার মাধ্যমে তাকে বিধবা, কিংবা তার থেকে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় তালাকপ্রাপ্তা হতে হবে।
৩. স্বামীর মৃত্যু বা তালাকের পর ইদ্দতকাল পার হতে হবে।

কিন্তু লোকেরা রাগের মাথায় চিন্তা ভাবনা ছাড়াই স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে দেয়। অতপর অনুশোচনা করে এবং পুনরায় তালাক দেয়া স্ত্রীকে পেতে চায়।

এমতাবস্থায় উপরোক্ত তিনটি শর্ত পূর্ণ করে তাকে পাওয়া কঠিন বা অসম্ভব বিধায় মাঝখানে ঐ মহিলার একটি কৃত্রিম বিয়ের ব্যবস্থা করা হয় এবং তালাক নেয়া হয়। এই বিয়ে এবং তালাক দুটোই সমঝোতা মূলক। -এটাই সমাজে প্রচলিত হিল্লা বিয়ে।

এটা অকাট্যভাবে নিষিদ্ধ এবং হারাম।

৯৫. মেয়েরা সাধারণত বাপের বাড়ি থেকে ওয়ারিশি বা উত্তরাধিকার নিতে চায়না। তারা ভাবে, এতে ভাইয়েদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে এবং বাপের বাড়ি যাওয়ার পথ বন্ধ হয়ে যাবে।

অপরদিকে পিতার মৃত্যুর পর ভাইয়েরা নিজেদের মধ্যে পিতার সম্পত্তি ভাগবাটোয়ারা করে নেয়, বোনদের অংশ পৃথক করে দেয়না।

অনেক সময়, মেয়েদের উত্তরাধিকার নেয়াকে অভদ্র, অসামাজিক ও অসম্মানজনক মনে করা হয়। -এ ব্যাপারে শরিয়তের বিধান কি?

ওয়ারিশি বা উত্তরাধিকার আল্লাহর নির্ধারিত অংশ। স্বয়ং আল্লাহ্ পাকই কুরআন মজিদে মৃত ব্যক্তির পুত্র, কন্যা ও আত্মীয় স্বজনের কে কতোটুকু উত্তরাধিকার পাবে তা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। দেখুন সূরা আন নিসা : আয়াত ৭,১১ ও ১২।

অতপর একই সূরার ১৩ নম্বর আয়াতে যারা আল্লাহর এই বন্টন অনুযায়ী উত্তরাধিকার বন্টন করে নেবে তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।

আর যারা আল্লাহর নির্ধারিত বন্টন অনুযায়ী ওয়ারিশি বন্টন করে নেবেনা ১৪ নম্বর আয়াতে তাদেরকে চিরস্থায়ী জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপের এবং অপমানকর শাস্তি প্রদানের ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

যারা বোনদেরকে পিতা মাতার ওয়ারিশি থেকে বঞ্চিত করে এবং তাদের অংশ বের করে না দিয়ে নিজেরা ভাগ বাটোয়ারা করে নিয়ে নেয়, তাদেরকে আল্লাহ চিরস্থায়ী জাহান্নামী বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

অপরদিকে কোনো মহিলাও যদি পিতা মাতার মৃত্যুর পর তাদের রেখে যাওয়া সম্পদ সম্পত্তি থেকে ওয়ারিশি না নিতে চান, তিনিও আল্লাহ্র আইন অমান্যকারী হিসেবে পাপী হবেন।

বোন আল্লাহ্র আইন অনুযায়ী ওয়ারিশি ভাগ করে নিলে ভাইদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হবে কেন? তাদের সাথে তো বোনের রক্তের সম্পর্ক, ওয়ারিশির সম্পর্ক নয়! রক্তের সম্পর্ক ছিন্নকারী ব্যক্তি জাহান্নামী।

ওয়ারিশি নিলে যদি বোনের সাথে রক্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়, তা হলে তো ওয়ারিশ নেয়ার কারণে ভাইয়ে ভাইয়েও সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাওয়ার কথা।

আসলে এগুলো সবই মনগড়া প্রথা বানিয়ে নেয়া হয়েছে।

তবে ছেলে বা মেয়ে যে কেউ নিজের অংশ দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী অন্য কাউকে দান করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে নিবন্ধন করতে হবে এবং সাক্ষী রাখতে হবে।

ওয়ারিশি নেয়া মেয়েদের জন্যে অসম্মানের নয়, বরং সম্মান ও মর্যাদার বিষয়। কারণ, আল্লাহ্র আইন পালনকারী মহিলারা মর্যাদাবানই হয়ে থাকে। আর যারা আল্লাহ্র আইন পালন করেনা, তারাই নিকৃষ্ট।

৯৬. আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে, স্বামী মারা গেলে স্ত্রী আর স্বামীর মুখ দেখেনা এবং স্ত্রী মারা গেলে স্বামী আর স্ত্রীর মুখ দেখেনা, মনে করা হয় তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে।

এটা একটা বিরাট ভুল, অজ্ঞতা এবং ভ্রান্ত প্রথা।

স্বামীর মুখ দেখার সবচেয়ে বেশি হকদার স্ত্রী এবং স্ত্রীর মুখ দেখার সবচাইতে বেশি হকদার স্বামী।

মৃত্যু দ্বারা স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন হয়না। জান্নাতেও এই সম্পর্ক অটুট থাকবে। মুমিন স্বামী স্ত্রী জান্নাতে স্বামী স্ত্রী হিসেবেই থাকবে (দেখুন আল কুরআন, সূরা রা'দ : আয়াত ২৩)

সমাজের এই প্রথা এক জঘন্য নিষ্ঠুর প্রথা। ভ্রান্ত প্রথা ভেঙ্গে চুরমার করে দিন।

৯৭. স্বামী মারা গেলে স্ত্রী এবং স্ত্রী মারা গেলে স্বামী কি মাইয়্যেতকে গোসল করাতে পারে? উল্লেখ্য আমাদের সমাজে একাজকে ঠিক মনে করা হয়না। অন্য লোক দিয়ে গোসল করানো হয়।

এটা ভুল ধারণা।

রসূলুল্লাহ সা.-এর মৃত্যু হলে তাঁর স্ত্রীগণই তাঁকে গোসল করিয়েছেন। আবু বকর রা.-কেও তাঁর অসিয়ত অনুযায়ী তাঁর স্ত্রীই গোসল করিয়েছেন।

সুতরাং উম্মতের জন্যেও এটাই উত্তম। এটা ঠিক মনে না করা অন্যায়। স্ত্রী মারা গেলে স্বামী গোসল করাবে কিনা? -এর জবাব হলো, স্বামীর গোসল করানোর ক্ষেত্রে হাদিসে নিষেধাজ্ঞা নেই।

তবে কোনো মহিলাও গোসল করাতে পারে।

আমাদের মতে, অন্য লোক দিয়ে গোসল করানোর চাইতে স্ত্রী বা স্বামী গোসল করানোই উত্তম।

৯৮. আমাদের সমাজে স্ত্রী স্বামীকে নাম ধরে ডাকেনা। ইসলামে কি স্বামীকে নাম ধরে ডাকা নিষেধ?

না, ইসলামে স্বামীর নাম ধরে ডাকা নিষেধ নয়। স্বামীর নাম ধরে না ডাকাটা একটা সামাজিক কুপ্রথা।

হাদিসে পাওয়া যায়, মহিলা সাহাবীগণ তাদের স্বামীর নাম নিতেন, নাম ধরে ডাকতেন।

সমাজিক প্রথা পালন করতে গিয়ে আমাদের দেশে মহিলারা অনেক আজগুবি আচরণ করে। আমি শুনেছি, এক মহিলার স্বামীর নাম ছিলো 'আকবর'। ছেলের নাম ছিলো 'বাদল'। ঐ মহিলা সালাতে বারবার 'আল্লাহু আকবর' বলার পরিবর্তে বলতো 'আল্লাহু বাদলের বাপ।'

আরেক মহিলার স্বামীর নাম ছিলো 'রহমতুল্লাহ'। এই মহিলা কাউকে সালাম দেয়ার সময় বলতো : আসসালামু আলাইকুম খোকার বাপ। সালাত শেষে সালাম ফেরানোর সময়ও একই কথা বলতো।

সুতরাং ভিত্তিহীন রসম রেওয়াজ পরিত্যাগ করুন।

৯৯. বাড়িতে খাবার রান্না বান্না করার পর মহিলারা নিজেরা না খেয়ে পুরুষদের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে। সমাজে প্রচলন আছে পুরুষদের আগে মহিলাদের খাওয়া নিষেধ। এটা কি ঠিক?

এটা ভ্রান্ত ধারণা। মহিলাদের এধরণের ভ্রান্ত প্রথা পালন করা উচিত নয়। ভ্রান্ত প্রথা ভাঙ্গা উচিত।

তবে কোনো মহিলা একত্রে খাওয়ার উদ্দেশ্যে নিজের স্বামীর জন্যে অপেক্ষা করাতে দোষ নেই।

সালাত সংক্রান্ত ভ্রান্তি

সালাত (নামায) আদায়ের ক্ষেত্রে আমাদের সমাজে অনেক ভুল ধারণা ও ভুল পদ্ধতি চালু আছে। এসব ভুলের অধিকাংশই করা হয় অজ্ঞতার কারণে। আর কিছু ভুল করা হয় মাযহাবের দোহাই দিয়ে।

এখানে আমরা কয়েকটি বড় বড় ভুল তুলে ধরছি:

১০০. নিয়্যত পাঠ করা: আমাদের দেশে নামাযের শুরুতে ব্যাপকভাবে "নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া....." বলে নিয়্যত পাঠ করা হয়। -এটা কি ঠিক?

এই নিয়্যত পাঠ করতে গিয়ে অনেক লোক জামাতের নামাযে রুকু মিস্ করে।

নামায পড়ে কিনা জিজ্ঞাসা করলে অনেক যুবক বলে: 'নিয়্যত জানিনা, তাই নামায পড়িনা।'

নামাযে নিয়্যত পাঠ করার কোনো নিয়ম নেই। রসূল সা. নামাযে নিয়্যত পাঠ করেন নাই। সাহাবীগণও করেন নাই। অতীতে কোনো আলেম উলামা করেন নাই। আমাদের দেশে বেহেশ্‌তি জেওর এবং মকসদুল মুমিনীন ধরণের বইতে মনগড়া নামাযের নিয়্যত লিখে দেয়া হয়েছে।

কোনো হাদিসে এ ধরণের কোনো নিয়্যতের উল্লেখ নাই। নামাযে নিয়্যত পাঠ করা একটা বড় বিদআত।

নিয়্যত মানে- সংকল্প, উদ্দেশ্য, ইচ্ছা, এরাদা। নামায পড়ার সংকল্প করার কারণেই একজন মুমিন কর্ম ব্যস্ততা ত্যাগ করে নামাযের দিকে ছুটে আসে।

সংকল্প করার কারণেই একজন মুমিন মসজিদের দিকে পা বাড়ায়। সংকল্প করার কারণেই একজন মুমিন ঘুম ত্যাগ করে নামাযের প্রস্তুতি নেয়।

সুতরাং একজন মুমিন যখন যে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে ঘুম ত্যাগ করে, কর্ম ব্যস্ততা ত্যাগ করে, পবিত্র হয়, অযু করে, ছুটাছুটি করে, নামাযের দিকে দৌড়ায়, মসজিদে আসে, নামাযে দাঁড়ায় তখন সেটাই তার সেই নামাযের নিয়্যত।

নামাযের উদ্দেশ্যে 'দাঁড়িয়ে তাকবীরে তাহরিমা' অর্থাৎ 'আল্লাহু আকবার' বলে নামায শুরু করবে। নিয়্যতের জন্যে মুখে কিছুই বলতে হবেনা।

এটাই আল্লাহ্‌র রসূলের সুন্নত।

১০১. মোজা পরা থাকলেও অনেকেই নামাযের সময় হলে ভীষণ কষ্ট করে পুনরায় মোজা খুলে পা ধুইয়ে অযু করে। মোজার উপর মাসেহ্ করেনা। তারা বলে: মাসেহ করার জন্যে চামড়ার মোজা প্রয়োজন। -এ ব্যাপারে সুন্নত নিয়ম কি? মোজা খোলে পা ধোয়ার মধ্যে কি বেশি সওয়াব আছে?

অযুর সময় রসূলুল্লাহ সা.-এর পায়ে মোজা পরা থাকলে তিনি মোজা খুলতেননা। মোজা এবং জুতার উপর মাসেহ্ করে নিতেন। এটাই ছিলো তাঁর সুন্নত।

মোজা কিসের তৈরি হতে হবে- সে ধরণের কোনো নির্দেশ তিনি দিয়ে যাননি। প্রচলিত নিয়মে মানুষ যেটাকে মোজা বলে মনে করে, সেটাই মোজা।

সুতরাং যে কোনো পবিত্র জিনিসের তৈরি মোজা পরা থাকলে তার উপরই মাসেহ্ করা যাবে।

মোজার উপর মাসেহ করা সুন্নত। কষ্ট করে মোজা খুলে পা ধোয়া এবং পুনরায় পা শুকিয়ে মোজা পরা সুন্নতের খেলাফ।

আরো বিস্তারিত জানার জন্যে পড়ুন আল্লামা হাফিয ইবনুল কাইয়্যিমের "আল্লাহ্‌র রসূল কিভাবে নামায পড়তেন?" বইটি।

১০২. ফরয নামাযে সালামের পর মুক্তাদিদের নিয়ে মুনাজাত করা কি সুন্নত?

সালাম ফিরানোর পর কিবলার দিকে ফিরে, কিংবা মুক্তাদিদের দিকে ফিরে হাত উঠিয়ে দোয়া বা মুনাজাত করার যে প্রথা চালু হয়েছে, তার কোনো প্রমাণ রসূলুল্লাহ সা. থেকে পাওয়া যায়না। সহীহ বা হাসান কোনো সূত্রেই পাওয়া যায়না। আবার অনেকেই খাস করে ফজর এবং আসর নামাযের পর মুক্তাদিদের দিকে ফিরে এরূপ মুনাজাত করার রীতি চালু করেছেন। কিন্তু এটাও রসূল সা. কিংবা খুলাফায়ে রাশেদীনের কোনো একজন থেকেও প্রমাণিত নয়। এমনটি করার কোনো নির্দেশ বা ইংগিতও তিনি উম্মতকে প্রদান করেননি।

যারা সালামের পর কিবলার দিকে ফিরে কিংবা ফজর ও আসরের পরে মুক্তাদিদের দিকে ফিরে মুনাজাত করার প্রথা চালু করেছেন, এটা তারা সুন্নতের বিকল্প হিসেবে চালু করেছেন। এটাকে তারা ভালো কাজ মনে করেন। সুন্নতের পরিবর্তে এমনটি করা ভালো কাজ কিনা তা আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

হাদিসে নামায সংক্রান্ত যতো দোয়ার কথা উল্লেখ হয়েছে, সবই রসূলুল্লাহ সা. নামাযের ভিতর করেছেন এবং নামাযের ভিতরে করার জন্যেই নির্দেশ দিয়েছেন।

বাংলাদেশ ও আশে পাশের অঞ্চলের লোকেরা নামাযের সাথে একাজকে একাকার করে ফেলেছে। অজ্ঞ লোকেরা নামাযের পর হাত উঠিয়ে মুনাজাত করাকে নামাযের অংগ বা নামাযের সাথে যুক্ত মনে করে। অথচ রসূল সা. এবং সাহাবায়ে কিরাম এমনটি করেননি। নামাযের ইমামগণ এমনটি করাকে বাধ্যতামূলক করে নিয়েছেন। অনেক ইমাম এমনটি করেন মুক্তাদিদের মন রক্ষার্থে, না করলে ইমামতি রক্ষা করা যায়না বলে। আসলে যে কাজটি আদৌ সুন্নত নয়, এমন একটি কাজকে সুন্নত বানিয়ে নেয়া, এমনকি ফরযের মতো অনিবার্য করে নেয়াটা কি যুক্তিসংগত হতে পারে?

আমরা বলবো, কোনো ইমাম যদি কখনো মুসল্লিগণকে নিয়ে হাত উঠিয়ে মুনাজাত করেন, তবে তা নাজায়েয নয়। কিন্তু এটাকে নিয়মে পরিণত করা এবং প্রত্যেক নামাযে অপরিহার্য ও অবধারিত করে নেয়া সুন্নতে রসূলের পরিপন্থী। অতপর মুসল্লিদের বিরাগভাজন হবার ভয়ে একাজ ঠিক নয় জেনেও ছাড়তে না পারা নিজেদের মনগড়া রীতিকে শরিয়তের বিধানে পরিণত করার নামান্তর নয়কি?

১০৩. রফে ইয়াদাইন করাকে আহলে হাদিসের নিয়ম বলা হয়। এটা কি ঠিক?

নামাযে রফে ইয়াদাইন করাকে আহলে হাদিসের নিয়ম বলাটা একটা মারাত্মক ভুল। এটা রসূলুল্লাহ সা.-এর সুপ্রমানিত সুন্নত।

রসূল সা. নামাযে তিন অথবা চার স্থানে রফে ইয়াদাইন করতেন। স্থানগুলো হলো :

১. তাকবীরে তাহরিমার সময়।
২. রুকুতে যাবার সময়।
৩. রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়াবার সময়।
৪. প্রথম তাশাহ্হুদ শেষে দাঁড়াবার কালে।

প্রথম তিনটি রফে ইয়াদাইনের কথা বর্ণনা করেছেন কমপক্ষে ত্রিশজন সাহাবী। তাঁরা রসূলুল্লাহ সা. সা.-এর নামযের নিয়ম বর্ণনা করতে গিয়ে তিন জায়গায় রফে ইয়াদাইনের কথা উলেখ করেছেন। এঁদের মধ্যে কয়েকজন সাহাবী চতুর্থ

রফে ইয়াদাইনের কথাও উল্লেখ করেছেন। এ সংক্রান্ত সবগুলো হাদিসই সহীহ সূত্রে বর্ণিত।

সুতরাং রফে ইয়াদাইন করা কোনো বিশেষ মযহাব বা আহলে হাদিসের রীতি নয়, স্বয়ং আল্লাহর রসূলের সুস্পষ্ট সুন্নত।

কেবল হানাফি মযহাবে একটি মাত্র স্থানে (তাকবীরে তাহরীমার সময়) রফে ইয়াদাইন করা হয়। বাকী সকলেই হাদিসে বর্ণিত তিন বা চার স্থানে রফে ইয়াদাইন করেন।

ইবনে মাসউদ রা.-এর একটি মাত্র বর্ণনার ফলে হানাফী মযহাব শুধু এক জায়গায় রফে ইয়াদাইন করে। অথচ ইবনে মাসউদ রা. বিশেষ কারণে শেষ দিকে একাধিক রফে ইয়াদাইন ত্যাগ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম তাঁর যাদুল মা'আদ গ্রন্থে বলেন:

ইবনে মাসউদ রা.-এর রফে ইয়াদাইন ত্যাগ করাটা এ জন্যে ছিলোনা যে, তিনি তা রসূলুল্লাহ সা. থেকে জানতে পেরেছেন। তিনি আসলে রফে ইয়াদাইনের সাথে বিরোধও করেননি এবং তার পরিপন্থি কাজও করেননি। ব্যাপারটা হলো, সেকালে আমীর-উমারারা দেরি করে নামাযে আসতেন। ফলে তিনি আযান-ইকামত ছাড়া ঘরেই নামায পড়তেন। এসময় তাঁর দুপাশে দু'জন মুক্তাদি দাঁড়াতো। তিনি ইমাম হিসেবে সামনে না দাঁড়িয়ে তাদের সমান্তরালে তাদের মাঝখানে দাঁড়াতেন। এতে করে রফে ইয়াদাইন করতে অসুবিধা হতো বলে তিনি তা করতেন না। (দ্রষ্টব্য, গ্রন্থ : আল্লাহ্‌র রসূল কিভাবে নামায পড়তেন?)

১০৪. আমাদের দেশে পুরুষ এবং মহিলারা কিছুটা ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে নামায পড়ে। পুরুষ এবং মহিলাদের নামায পদ্ধতিতে পার্থক্য করা কি বৈধ?

রসূলুল্লাহ সা. মহিলাদের জন্যে নামাযের আলাদা কোনো পদ্ধতি দিয়ে যাননি। পুরুষ ও মহিলাদের নামায পড়ার পদ্ধতি একই। পার্থক্য করা সুন্নতের খেলাফ।

হাদিস থেকে জানা যায়, রসূল সা. মহিলাদের নামাযের ব্যাপারে কয়েকটি বিশেষ কথা বলে গেছেন। তাহলো:

১. তোমরা আল্লাহ্‌র দাসীদের (মহিলাদের) মসজিদে যেতে নিষেধ করোনা।
২. মহিলাদের ঘরে নামায পড়া উত্তম।

৩. জামাতের নামাযে ইমাম ভুল করলে মহিলারা আল্লাহু আকবার বা সুবহানাল্লাহ না বলে এক হাতের তালু দ্বারা আরেক হাতের তালুতে থাপ্পড় দিয়ে আওয়াজ করবে।
৪. ইমামের ভাষণ শুনার জন্যে মহিলাদের জুমা এবং ঈদের জামাতে উপস্থিত হওয়া উত্তম।
৫. মহিলারা মসজিদে যেতে সুগন্ধি ব্যবহার করে যাবেনা।

এ বিষয়গুলো ছাড়া নামায পড়ার পদ্ধতিতে কোনো পার্থক্য নেই।

১০৫. জামাত শুরু হলে সুন্নত পড়া

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: যখন জামাতের জন্যে ইকামত বলা হবে (অর্থাৎ যখন ফরয নামাযের জামাত আরম্ভ হবে), তখন ঐ (ফরয) নামাযটি ছাড়া আর কোনো নামায নেই।" (সহীহ মুসলিম)

এই হাদিসের 'আর কোনো নামায নেই'- কথাটির অর্থ হলো, ফরয নামাযের জামাত দাঁড়িয়ে গেলে আর অন্য কোনো নামায পড়া যাবেনা।

এই হাদিসের ভিত্তিতে ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেছেন: ফরয নামাযের জামাত দাঁড়িয়ে গেলে সুন্নত নামায ত্যাগ করতে হবে এবং জামাতে শামিল হয়ে যেতে হবে।

ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেছেন: ফজরের জামাত এক রাকাত পাবার সম্ভাবনা থাকলেও সুন্নত পড়ে নেয়া যাবে। তবে সুন্নত পড়ার জন্যে সফের (কাতারের) নিকট থেকে দূরে দাঁড়াতে হবে। তাঁর মতে সফের নিকট দাঁড়ানো মাকরূহ।

হাদিস বিশেষজ্ঞদের মতে, উক্ত হাদিস অনুযায়ী জামাত দাঁড়িয়ে যাবার পর সুন্নত নামায পড়ার কোনো অবকাশ দেখা যায়না। কারণ-

- এমনটি করার অনুমতি রসূলুল্লাহ সা. দেননি।
- সাহাবায়ে কিরাম থেকে এমনটি করার নযীর নেই।
- ফজরের সুন্নতের গুরুত্ব অন্যান্য সুন্নত নামাযের তুলনায় বেশি হলেও সেটা সুন্নতই, ফরয নয়।
- মুয়াজ্জিনের ইকামত দেয়ার অর্থই হলো, ইমামের পক্ষ থেকে জামাতে শরীক হওয়ার আহবান জানানো। আর (ফরয নামাযের জন্যে) ইমামের আহবানে সাড়া দেয়া তো ওয়াজিব।

সুতরাং এ হাদিসটির স্পষ্ট অর্থ এবং যুক্তি অনুযায়ী জামাত শুরু হয়ে গেলে সুন্নত পড়ার অবকাশ থাকেনা।

১০৬. আমাদের দেশে নামায কসর করার জন্যে সফরের দূরত্ব নিয়ে ঝগড়া করা হয়। কতো দূরের সফরে নামায কসর করা যাবে?

রসূলুল্লাহ সা. সফরের দূরত্বের কোনো সীমা রেখা নির্ধারণ করে দেননি। সাহাবীগণও কোনো সীমা রেখার কথা বলেননি। কতোটা দূরের সফর হলে নামায কসর করা যাবে, দুই নামায একত্র করা যাবে, (ফরয) রোযা স্থগিত করা যাবে- এসবের কিছুই রসূল সা. উল্লেখ করেননি। রসূল সা. এবং তাঁর সাহাবীগণ সাধারণভাবে সফর শব্দ ব্যবহার করেছেন।

কেউ কেউ মক্কা ও জিদ্দার ব্যবধান এবং মক্কা ও তায়েফের ব্যবধানকে (অর্থাৎ ৪৮ মাইলকে) সফরের নূন্যতম স্ট্যান্ডার্ড ধরেছেন। কিন্তু রসূল সা. এবং সাহাবীগণ এমন কিছু নির্ধারণ করে দেননি। তাঁরা সফর কথাটি বলেছেন। সুতরাং যে দূরত্বকে সাধারণভাবে সফর বলা হয়, সেটাই সফর। মাইল নির্ধারণ করা আমাদের দায়িত্ব নয়।

তাই 'সফর' বলা হয় এমন ছোট বড় সব সফরেই কসর করা, দুই নামায একত্র করা, রোযা স্থগিত করা, তাইয়াম্মুম ইত্যাদি বৈধ।

১০৭. আমাদের দেশে সফরে দুই নামায একত্রে পড়া নিয়ে ঝগড়া হয়। হানাফীরা বলে আরাফা ছাড়া আর কোথাও দুই নামায একত্রে পড়া যাবেনা। অথচ হাদিসে এর বিপরীত দেখা যায়।

রসূলুল্লাহ সা. বিদায় আরাফা ছাড়াও তবুক এবং অন্যান্য সফরে দুই নামায একত্রে পড়েছেন। এ বিষয়ে অনেকগুলো হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

রসূলুল্লাহ সা.-এর রীতি ছিলো, তিনি যদি সূর্য হেলার আগে সফরে বেরোতেন, তাহলে যুহর নামাযকে আসরের ওয়াক্ত পর্যন্ত বিলম্বিত করতেন। অতপর আসরের সময় যুহর ও আসর একত্রে পড়তেন। যদি সূর্য হেলার পর সফরে রওয়ানা করতেন, তাহলে যুহরের সময় যুহর ও আসর একত্রে পড়ে রওয়ানা করতেন।

যদি মাগরিবের সময় তাড়াহুড়া করে যাত্রা শুরু করতেন, তাহলে মাগরিবের নামাযকে বিলম্বিত করে ইশার সময় মাগরিব ও ইশা একত্রে পড়তেন।

রসূলুল্লাহ সা.-এর তবুক সফর সম্পর্কে বর্ণিত হাদিস থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তাতে বলা হয়েছে: তবুক সফরে কোনো মনযিল থেকে রওয়ানা করার প্রাক্কালে রসূল সা. যদি সূর্য হেলার পরে রওয়ানা করতেন, তবে যুহরের সময় যুহর ও আসর একত্রে পড়ে রওয়ানা করতেন। যদি সূর্য হেলার পূর্বে যাত্রা করতেন, তবে যুহরকে বিলম্বিত করে আসরের সময় যুহর ও আসর একত্রে পড়তেন। মাগরিব এবং ইশার ক্ষেত্রেও অনুরূপ করতেন।

সহীহ বুখারিতে ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ সা. সফরে থাকাকালে যুহর ও আসর নামায একত্রে পড়তেন এবং মাগরিব আর ইশাও একত্রে পড়তেন।

বুখারিতে আনাস রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে: রসূল সা. সফরে মাগরিব ও ইশা একত্রে পড়তেন। বুখারিতে আনাস রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে : রসূল সা. সূর্য হেলার পূর্বে যাত্রা করলে যুহরকে আসর পর্যন্ত বিলম্বিত করতেন এবং আসরের সময় যুহর ও আসর একত্রে পড়তেন।

১০৮. বেশি সওয়াবের আশায় কোনো বিশেষ মসজিদে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে সফর করা বৈধ কি?

লোকেরা এমনটি করে থাকে। কিন্তু এ কাজ বৈধ নয়। উপরের প্রশ্নটির জবাবে যে হাদিসটি উল্লেখ করা হয়েছে, সেটিই এর প্রমাণ।

মূলত ঐ তিনটি মসজিদ ছাড়া আর কোনো মসজিদের কোনো বিশেষত্ব নেই।

নিম্নোক্ত বিষয়গুলোও সালাত সংক্রান্ত ভ্রান্তি :

১০৯. ঘরে না পড়ে সব সুন্নত নামায মসজিদে পড়া।

১১০. ইচ্ছাকৃত পুরুষদের ফরয নামাযের জামাত ত্যাগ করা।

১১১. ধারণা অনুমানের ভিত্তিতে নামায হলো কিনা- চিন্তা করে সন্দেহে পড়ে থাকা।

১১২. মুসল্লিদের অবস্থা বিবেচনা না করে ইমামের কিরাত ছোট বা বড় করা।

১১৩. নামাযের বিভিন্ন স্থানে রসূল সা.-এর শিখানো দোয়া না করা।

১১৪. নামাযে তাড়াহুড়া করা।

১১৫. লোক দেখানোর জন্যে নামায পড়া।

১১৬. নামায পড়তে আলসেমি করা।

১১৭. নামাযের চাইতে দুনিয়াবি কাজকে প্রাধান্য দেয়া।

প্রচলিত অন্যান্য ভ্রান্তি সমূহ

১১৮. কুরআনে ব্যবহৃত আরবি পরিভাষা পরিবর্তন করে আমাদের দেশে আল্লাহকে খোদা, সালাতকে নামায, সিয়ামকে রোযা বলা হয়। এরকম আরো অনেক পরিভাষাকে পরিবর্তন করা হয়েছে। -এগুলো কি গ্রহণযোগ্য?

পরিবর্তিত পরিভাষাগুলো ফারসি। আমাদের দেশে ইসলাম এসেছে ফারসিভাষী ইরানী ও আফগানদের মাধ্যমে। ফারসিভাষী মুসলিমরা এই উপমহাদেশ শাসন

করেছে কয়েক শতাব্দী। ফলে তাদের ভাষা এবং পরিভাষা আমাদের দেশে ব্যাপক চালু হয়ে গেছে। ফারসি ভাষার বিশাল শব্দ সম্ভার বাংলা শব্দভান্ডারে মিশে গিয়ে বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে।

মূলত আল্লাহকে খোদা, সালাতকে নামায, সিয়ামকে রোযা বানানো হয়েছে ইরানে, আফগানিস্তানে। এদেশে তাদের আগমন এবং দীর্ঘ শাসন, দীন প্রচার ও শিক্ষা প্রসারের ফলেই তাদের ভাষার শব্দ ভান্ডার আমাদের ভাষায় মিশে গেছে।

ইসলামি পরিভাষাগুলোর অনুবাদ করা একটা ভুল এবং মারাত্মক ভুল। কারণ, শব্দানুবাদে পরিভাষার সঠিক অর্থ ও তাৎপর্য প্রকাশ পায়না।

সুতরাং যেসব পরিভাষা কুরআনে এবং হাদিসে ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলোকে কুরআন এবং হাদিসের ভাষায় হুবহু সংরক্ষণ করা মুসলিম উম্মাহ্‌র কর্তব্য।

কুরআন হাদিসে ব্যবহৃত পরিভাষাগুলো হুবহু কুরআন হাদিসের ভাষায় (অর্থাৎ আরবি ভাষায়) সংরক্ষণ করা, ব্যবহার করা এবং চালু রাখা সারা বিশ্বের সকল ভাষার মুসলিম জনগণের অবশ্য কর্তব্য।

কারণ পরিভাষা হারিয়ে গেলে কিংবা পরিভাষার অনুবাদ চালু করা হলে ইসলামের মূল ভাব, স্পীরিট, কালচার এবং ঐতিহ্য বিনষ্ট হতে বাধ্য।

তাই, বিশ্বের সকল ভাষাভাষী মুসলিমদের উচিত অনুবাদ ব্যবহার না করে আল্লাহকে আল্লাহ, সালাতকে সালাত, সিয়ামকে সিয়াম, যাকাতকে যাকাত, হজ্জকে হজ্জ, আযানকে আযান, মসজিদকে মসজিদ, কা'বাকে কা'বা, কিবলাকে কিবলা, ইবাদতকে ইবাদত, দীনকে (ধর্ম নয়) দীন, ঈমানকে (বিশ্বাস নয়) ঈমান, ইসলামকে ইসলাম, তাকওয়াকে তাকওয়া, ইহসানকে ইহসান, কুরআনকে কুরআন, সুন্নাহ্‌কে সুন্নাহ্‌, হাদিসকে হাদিস বলা।

আরো কয়টি নিষিদ্ধ বিষয় হলো :

১১৯. মুসলিম সমাজে অশ্লীলতা ছড়ানো এবং প্রসার করা ফাসেকি।

১২০. ময়লা এবং অসুন্দর পোশাক পরা সুন্নতের খেলাফ।

১২১. সুদী কারবারে এবং সুদী চাকুরিতে জড়িত হওয়া বড় গুনাহ!

১২২. প্রতারণামূলক ব্যবসা করা হারাম।

১২৩. নারী কর্তৃক পুরুষের পোশাক পরা এবং পুরুষ কর্তৃক নারীর পোশাক পরা হারাম।

সমাপ্ত